ভারত ভ্রমণ।

(প্রথম খণ্ড।)

শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত

বিরচিত।

But my soul wanders ; I demand it back
To meditate amongst decay, and stand
A ruin amidst ruins ; there to track
Fallen states and buried greatness, o'er a land
Which was mightiest in its old command,
And is the loveliest, and must ever be :—
The master-mould of nature's heavenly hand,
Wherein were cast the heroic and the free,
The beautiful, the brave, the lords of the earth
and [illegible]

Byron.

কে, সি, দাঁ এণ্ড কোং

কর্ত্তৃক

[illegible] নং কলেজ স্কোয়ার ভবনে প্রকাশিত।

মূল্য চৌদ্দ আনা। ডাঃ মাঃ এক আনা।

উপহার।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ
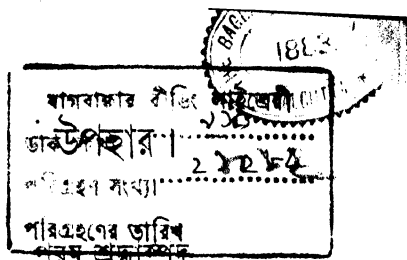
শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায়

ও

শ্রীযুতা ষোড়শীবালা রায়

কর কমলে।

আপনারা নিঃসন্তান। আপনাদের স্নেহ অন্যে পরিচালিত। দীর্ঘকাল যাবত আপনাদের যে নিঃস্বার্থ স্নেহ ভোগ করিয়া আসিতেছি, হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি ভিন্ন তাহার প্রতিদান করিবার আমার আর কিছুই নাই। আজি সে ভক্তিভরে এই গ্রন্থখানা আপনাদের উভয়ের করে উপহার প্রদান করিলাম। আপনারাও সে স্নেহভরেই, ইহা হস্তে তুলিয়া লইলে, আমি বড় সুখী হইব।

কলিকাতা
মাঘ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ

চির স্নেহাভিলাষী
গ্রন্থকার।

পূর্ব্ব কথা।

বঙ্গভাষায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি প্রায় তিন বৎসর কাল ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। ইহাতে আমার দৃষ্ট স্থান সমূহের যথাযথ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বিবরণ সংগ্রহের জন্য আমাকে কখনও বা ইতিহাসের উপর নির্ভর করিতে হই-য়াছে; দুই এক জন বিদেশী ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত আলোচনা করিতে হইয়াছে; কোথাও জন প্রবাদ, কিম্ব-দন্তি, এমন কি, স্থানীয় সাধারণ লোকের মত অবলম্বন করিয়াও সত্য উদ্ধারে যত্নপর হইয়াছি; ইহাতে সহজেই মাঝে মাঝে ভ্রম প্রমাদে পড়িবার সম্ভাবনা। পাঠক, সেই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। "ভারত ভ্রমণ" আমার শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক এই ত্রিবিধ ব্যয়ের ফল। আপনারা এই ফল আস্বাদনে বিন্দুমাত্র সুখী হইলেও পরিশ্রম সকল জ্ঞান করিব। উপসংহারে বক্তব্য—শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার "যমুনা-লহরী" নামক গানটী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া ও আমার রাজ-পুতানা অবস্থান কালে বন্ধুবর শ্রীযুত বাবু গুণাভিরাম পাঠক

মহাশয় খাজা সাহেবের বিবরণ সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করিয়া পরম উপকৃত করিয়াছেন।

এক খণ্ডে গ্রন্থ কলেবর নিতান্ত বৃহত হইয়া পড়ে বলিয়া, দিল্লীর বিবরণেই আমরা প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিলাম। রাজপুতানার অন্যান্য দৃষ্ট স্থান, মালব, মধ্যভারতবর্ষ, বম্বে ও মধ্য প্রদেশ ইত্যাদি স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত দ্বিতীয় খণ্ডে পরিসমাপ্ত হইবে। পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের ত্রস্ততা নিবন্ধন সময় সময় আমি নিজে প্রুফ সংশোধন করিতে পারি নাই। তাহাতে মাঝে মাঝে ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। পাঠক ইহাও আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।

ভারত ভ্রমণ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীরামপুর—মাহেশ—চন্দননগর—চুঁচড়া—হুগলী—
সপ্তগ্রাম—পাণ্ডুয়া—বর্দ্ধমান।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের ইচ্ছারও বেগ বৃদ্ধি হয়। এক স্থানে থাকিয়া থাকিয়া, যখন মানুষের প্রাণ আর তাহাতে মজিতে চাহে না, তখনই মানুষ, নূতনের জন্য লালায়িত হয়। নূতনের পর নূতন পাইতে, নূতন শুনিতে, নূতন দেখিতেই, মনুষ্য হৃদয়ের অনন্ত বাসনা। দেশে থাকিয়া, আর মন প্রাণ তৃপ্ত হইতেছে না। বাসনা যেন ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিতে চাহিল। আর এক কথা—সংসারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বড় কম। অতি বাল্যকাল হইতেই সংসারের সহিত এ বিরোধটা চলিতেছিল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে,

সংসারের সহিত সে পার্থক্য যেন আরও বিস্তৃত হইয়া দাঁড়াইল ; আমি বড় অসুখ বোধ করিতে লাগিলাম। কোন মতেই মন আর ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। দিবা নিশি যেন প্রাণের ভিতরে কে বলিত, "ছুটিয়া যা—স্বাধীন মন লইয়া ছুটিয়া যা। যাইয়া সংসার অধ্যয়ন কর, সংসার অধ্যয়ন করিলে, তোর হৃদয়ে আবার শান্তি ফিরিয়া পাইবি।" এ জন্যই বোধ হয় একজন বড় লোক বলিয়াছেন "Travel is the best cure for heart-ache" (ভ্রমণই হৃদয় বেদনার মহৌষধ)। আমি জানি না—মুখ ফুটিয়া কাহাকে বলিতে পারি নাই, আমার হৃদয়ে কিসের বেদনা ছিল। এই মাত্র জানিতাম, আমার হৃদয়ে একটা বেদনা ছিল। সময় সময় সে বেদনায় ব্যথিত হইয়া, বড় কাতর হইয়া পড়িতাম। সংসারের কাছে বলিতে পারিতাম না, কেহ আসিয়া আমার হৃদয়ের বেদনা দূর করিতেও পারিত না। পোড়া সংসারে কয়জন লোক, কয়জন লোকের হৃদয় বেদনা দূর করিতে পারিয়াছে ? প্রাণের ব্যথায় এরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া, অবশেষে স্থির করিলাম, এক দিকে ছুটিয়া যাইব ! শ——নামে আমার একটী আত্মীয় বালক আমার কথায় বড় সহানুভূতি প্রকাশ করিত। তাহার সহানুভূতি দেখিয়া, এক দিন তাহাকে মনের কথা গুলি খুলিয়া বলিলাম। সে বলিল, "আমিও আপনার সঙ্গে যাইব"। একদিন গোলদিঘীর বাগানে বসিয়া, নানা পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরের পর যাওয়ার দিন স্থির

করিলাম। তখন আমরা উভয়েই অভিভাবকের অধীন, অভিভাবক জানিতে পারিলে, এক জনকেও ছাড়িয়া দিবেন না। অন্যান্য বালকেরা যেমন সচরাচর অভিভাবককে লুকাইয়াই চম্পট দেয়, আমরাও সে 'সদুপায়' অবলম্বন করিতেই মনস্থ করিলাম। যাইবার দিন উপযুক্ত পাথেয় ইত্যাদি কিনিয়া লইলাম। চন্দননগর যাইব বলিয়া বাড়ীর আর দুটী ছেলেকে রেলওয়ে ষ্টেসনে লইয়া গেলাম। একটী ছেলের নিকট আগেই আমাদের পালাইয়া যাওয়ার কথাটা বলিয়াছিলাম; নতুবা (ঈশ্বর না করুন,) বিদেশে বিপদে পড়িলে খবর যোগাইবে কে?

১৮৮১ সনের ১৯শে জুলাই (১২৮৮ বঙ্গাব্দের ৫ই শ্রাবণ) আমরা কলিকাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বাহ্ণ ৯১ ঘটিকার সময় হাওড়া ষ্টেসনে রওনা হইলাম। বন্ধুবান্ধবের নিকট উভয়েই রাশি রাশি চিটী লিখিয়া রাখিয়াছি। তখন মনের আবেগে যেরূপ উপন্যাসের আকারে চিটী লিখিয়াছিলাম, তাহা পড়িয়া, নিশ্চয়ই বন্ধুবান্ধব মনে ভাবিয়াছিলেন, আমরা হয়ত একবারে ইহ সংসার ছাড়িয়াই চলিলাম। হাওড়া ষ্টেসনে যাইয়া চিটী গুলি ডাক বাক্সে ফেলিলাম। আমার সঙ্গী শ্রীমান শী——আমাপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট। তাহার মনে তখন এরূপ আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল যে, অন্য একটী বালককে ষ্টেসনে পৌঁছিয়াই আমাদের গৃহ ত্যাগের কথা সমুদয় বলিয়া ফেলিল। সে বালকটী

একটুকু নরম প্রকৃতির ছেলে, শ্রীমান শ——র তৎকালীন উদাসপূর্ণ বিদায় গ্রহণ, হৃদয়ের গভীর বেগ দেখিয়া, বালকটী একবারে কাঁদিয়াই ফেলিল। শ্রীমান শ——রও তদ্দর্শনে দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল বাহির হইয়া ছিল, ভায়া চালাক ছেলে, তাহা "আচলে" মুছিয়া ফেলিলেন। বালকদ্বয়ের অপরটী কিছু ভিন্ন প্রকৃতির ছেলে; সংসারের কোন বিষয়ে তাহাকে অভিভূত করিতে পারে, আমার এরূপ বিশ্বাস নাই। সে কিন্তু আমাদের এরূপ "ব্রজলীলা" দেখিয়া শুনিয়া, একবারে হাসিয়াই অস্থির। আমরা যে গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া, সে গাড়ীখানা বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইবে। আমি বর্দ্ধমানের দুই খানা টিকেট করিয়া আনিয়াছি। আমাদের অন্য একজন বন্ধু, কি জানি কেমন করিয়া, আমাদের পলায়নবৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়ার অনতিপূর্ব্বে সেই বীরপুরুষ বীরবেগে আসিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত! শ্রীমান শ—কে তিনি কোন মতেই ছাড়িয়া দিবেন না; তাহাকে ফিরাইতে তিনি সাধ্যায়ত্ত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শ—কোন মতেই ফিরিতে চাহিল না। ভায়াতে ও বন্ধুবরে একটী ছোট খাট রকমের 'পলাশি-যুদ্ধের' পর ভায়াই জয়ী হইলেন। আমরাও পরিত্রাণ পাইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। বন্ধু মহাশয় পরের গাড়ীতে আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন বলিয়া, ভয় দেখাইয়া গেলেন। ইহার মিনিট তিনেক পরেই গাড়ী আমাদিগকে লইয়া "হকাহক্" শব্দে ষ্টেসন ছাড়িয়া চলিল।

ভায়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ভাবাক্রান্ত! এখন চিন্তা,—ভায়াকে প্রফুল্ল করি কেমন করিয়া? "আত্ম তুষ্টে জগত্তুষ্ট" আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভায়াও প্রফুল্ল হইবে, ইহা ভাবিয়া গাড়ী ছাড়ার অনতিপরই, আমি কিঞ্চিৎ জলযোগে মনোনিবেশ করিলাম। একবার নয়—দুইবার এইরূপ আত্মতুষ্টিতে ভায়াকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার এই মহা আত্মোৎসর্গেও ভায়া প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিতে পারিলেন না। তখন দুঃখিত হইয়া মনে মনে বলিলাম; "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।" স্নেহ বেগে যে, আমি কতগুলি খাদ্য উদরসাৎ করিয়া বসিয়াছি, ভায়া আর তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ভায়াটী হয়ত ভাবিলেন, দাদাটী কি রাক্ষসটী!

হাওড়া হইতে বৰ্দ্ধমান পৰ্য্যন্ত রেল পথের দুই ধারে আমরা যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া চলিলাম, সে সমস্ত ষ্টেসনে ষ্টেসনে নামিয়া, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই। ইহার কিছু দিন পূৰ্ব্বেই ভায়াতে আমাতে সে সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ছিলাম। তাহাদিগের খ্যাতনামা কয়েকটী স্থানের অতি সংক্ষেপ বিবরণ এখানে লিখিত হইল।

শ্রীরামপুর—বঙ্গদেশে ইয়ুরোপীয় জাতির আগমনের পর, দিনেমার দিগের প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল। তাঁহারা বাণিজ্য ছলে প্রায় একশত বৎসর কাল এস্থানে বাস করিয়া গিয়াছেন। তৎসাময়িক কতকগুলি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ

ভিন্ন এখন আর, সেস্থানে বিশেষ কিছু পরিলক্ষিত হয় না। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপই হউক, এই শ্রীরামপুরই বাঙ্গালার বর্ত্তমান উন্নতির ভিত্তিভূমি। কেরি, মার্সম্যান প্রভৃতি যে সকল মহাপ্রাণ ইংরেজ ভারতের হিত কামনায় জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই স্ব স্ব মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত এই স্থানে। কেরি ও হালহেড্ মহাত্মাই বাঙ্গালা ভাষার গঠ-নেচ্ছু হইয়া, ১৭৭৮ খৃঃঅব্দে এস্থানে প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করিয়া ছিলেন। কেরি সাহেবই মুদ্রাযন্ত্রে প্রথম বাঙ্গালা অক্ষর ব্যবহার ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র প্রচার করিয়া, বাঙ্গালার বর্ত্তমান উন্নতির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক সে সময় যে সকল মহাপ্রাণ, সহৃদয় ইংরেজ বঙ্গদেশের উন্নতিকল্পে ধন, মান ও জীবন ব্যয় করিয়া, লোকহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আজিও—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীতথা
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহা পাতক নাশনং।

এই প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোকোক্ত ভারত মহিলাদের ন্যায় তাঁহাদের নামময়,

"হেয়ার কল্‌ভিন্‌ প্যামরশ্চৈব কেরি মার্সম্যানস্তথা
পঞ্চগোরান্ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনং।"

শ্লোক বঙ্গবাসী শিক্ষিত নরনারীর কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সাক্ষী স্বরূপ প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়েও এস্থানটী বেশ পরিষ্কৃত ও দেখিতে সুন্দর। শ্রীরামপুর হুগলী জেলার একটি সবডিভিসন। তারকেশ্বর, মাহেশ প্রভৃতি দেবস্থান এই সবডিভিসনের অন্তর্গত। শ্রীরামপুরের অপর পারেই গঙ্গাতীরে বেরাকপুর গবর্ণর্ জেনেরেলের বাড়ী বক্ষে করিয়া, স্বচ্ছ-গঙ্গাসলিলে আপনার সুন্দর মুখ দেখিতেছে।

মাহেশ---শ্রীরামপুর সহরের কিঞ্চিৎ উত্তরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহা বৈষ্ণব দিগের একটী প্রধান দেবস্থান। এ স্থানে জগন্নাথ, বলরাম ও দ্বাদশ গোপালের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রথ যাত্রার সময় এখানে খুব ধুমধামের সহিত এক মেলা হয়। মাহেশের রথযাত্রা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, জগন্নাথ বলরাম পরিব্রাজক বেশে মাহেশে উপস্থিত হইয়া ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়া পড়েন। সঙ্গে একটী পয়সাও নাই ক্ষুধায় আর কি করেন? আপন আপন গলহার এক দোকানদারের নিকট বন্ধক রাখিয়া, তদ্বিনিময়ে কিঞ্চিৎ মেঠাই মোণ্ডা ক্রয় করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। পরে তাহাদের অভিভাবক পাণ্ডাগণ পুরী হইতে মাহেশে আসিয়া, উহা খালাস করিয়া লইয়া গেলেন। দেবতাই বল আর যাহাই বল, ক্ষুধার যন্ত্রণায় সবাই অস্থির!! ক্ষুধার দায় কেহই এড়াইতে পারেন না।

মাহেশের নিকটবর্ত্তী বৈদ্যবাটী নামক স্থানে নিমাই তীর্থের ঘাট বলিয়া একটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে। তৎসম্বন্ধে ও এরূপ একটী কিম্বদন্তী আছে যে, জগন্নাথ বলরাম ক্ষুধায় কাতর হইয়া সেই ঘাটের নিকটস্থ এক দোকানীর নিকট আপনাদের স্বর্ণ বলয় বন্ধক রাখিয়া, ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব এই ঘাটে মস্তক মুণ্ডন করিয়া, সংসারের বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার কোনটী প্রসিদ্ধ তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

চন্দননগর—১৬৭৩ খৃঃ অব্দে ফরাসিগণ চন্দননগরে আপনাদের বাণিজ্যাস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহা একটী সামান্য বাণিজ্য স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল; কিন্তু বীরপুরুষ ডিউপ্লের (Deuplex) সময় হইতেই ইহার শোভা সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিল। সে সময়ে নানা চক্রান্তে রাশি বীর্য্য পরাস্ত না হইলে, দেবপুরুষ নেপোলিয়ানের সময় নৌতাধ্যক্ষ এডমিরেল ব্রুইসের (Admiral Brueys) অমনোযোগিতায় আবুকারে সমরপোত সকল (Fleet) তদীয় জীবন সহ বিনষ্ট না হইলে, হয়ত চন্দননগরই আজি সমগ্র ভারতের রাজধানীতে পরিণত হইত। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ সিংহ চন্দননগরের দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন। এখনও সে স্থানটী "গড়" নামে অভিহিত হইয়া, ভূতপূর্ব্ব ফরাশি দুর্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। ফরাশি রাজ্যবিপ্লবের সময় এই স্থানেও অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক রাজ্যবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল।

বিদ্রোহীগণ ফরাশি গবর্ণরকে বন্দী করিয়া কালাপানি পার করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন ব্রিটিশ গবর্ণর জেনেরেল কর্ত্তৃক বিদ্রোহী গণের হস্ত হইতে তিনি মুক্তি লাভ করিলেন। নেপোলিয়ানের অভ্যুদয় কাল হইতে তাঁহার পতন পর্য্যন্ত চন্দননগর ব্রিটিশ কবলে কবলিত ছিল। সুবিখ্যাত ওয়াটারলু-সমরে পরাজিত হইয়া, ফরাশি-কেশরী দেব পুরুষ নেপোলিয়ন সেণ্টহেলেনায় নির্ব্বাসিত হইলেন। তৎপর ইয়োরোপে সুপ্রসিদ্ধ সার্ব্বজনীন মহাসন্ধি স্থাপনের পর চন্দননগর আবার ফরাশিদিগকে প্রত্যর্পিত হইল। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত উহা ফরাশি অধিকারে শাসিত।

চন্দননগর দেখিতে অতি সুন্দর ও পরিষ্কৃত স্থান; বিশেষতঃ চন্দননগরের গঙ্গাতীরের দৃশ্য অতি মনোহর। কলিকাতার গোল দিঘী, লাল দিঘী, চাঁপাতলা প্রভৃতি পুকুর ও স্থান সমূহের ন্যায়,চন্দননগরে ও গোলদিঘী, চাঁপাতলা প্রভৃতি নামে পুকুর ও স্থান দৃষ্ট হয়। কলিকাতার, ঠন ঠনিয়ার ন্যায় এস্থানেও একটী স্থানের নাম “ ঢেব্ ঢেবিয়া ”। চন্দননগর বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলেন “কোন দিন উহাও ঠন্ ঠনিয়া ছিল এখন ঢেব্ ঢেবিয়া হইয়া গিয়াছে।” চন্দননগরের বর্ত্তমান গবর্ণরের বাড়ীটী একটী দেখিবার বিষয় বটে।

চূঁচড়া—বর্ত্তমানহুগলী জিলার দক্ষিণাংশের নাম চূঁচড়া। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজগণ এস্থানে অবস্থান করিয়া, বঙ্গদেশে

বাণিজ্য করিতেন। পলাশী সমরক্ষেত্রে বঙ্গের এরূপ সহজ পতন দেখিয়া. তাঁহারা ও রাজ্য বর্দ্ধনেচ্ছু হইয়া উঠিলেন এজন্য চুঁচড়ার ৪ মাইল দূরস্থ "বিদারা" মাঠে ইংরেজদিগের সহিত উহাদের এক ক্ষুদ্র সংগ্রাম হয়। তাহাতে ওলন্দাজ-গণ পরাজিত হইয়া, নিতান্ত হীনতেজ হইয়া পড়িলেন! তাহার দীর্ঘকাল পরে ইংরেজ রাজ. ভারত মহাসাগরান্তর্গত যাবা দ্বীপের পরিবর্ত্তে চুঁচড়া আপন রাজ্যভূক্ত করিয়া লইলেন। চুঁচড়ার বর্ত্তমান কলেজ ভবনটী পূর্ব্বে সুবিখ্যাত ফরাশি জেনেরল (Perron) পেরণ সাহেবের বাসস্থান ছিল। ওলন্দাজ দিগের সামরিক অন্য কোন চিহ্নই চুঁচড়াতে এখন পরিলক্ষিত হয় না।

হুগলী।—চুঁচড়ার উত্তর প্রান্তস্থিত স্থানটীরই পুর্ব্ব নাম হুগলী। ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে উহা পর্ত্তুগীজ দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গের এস্থানে অবস্থান করিয়াই পূর্ব্বে পর্ত্তু-গীজ" যাজক-দস্যুগণ ছলে বলে হিন্দু বালকবালিকা-গণকে অপহরণ করিয়া, তাহাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন; ও দাস দাসীর ন্যায় নানা স্থানে বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করিতেন। বাস্তবিকও সে সময় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ এরূপ 'নিঃস্বার্থ সাধুভাব' দেখাইয়া, ভারতের অনেক স্থানেই নানা কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখনও দক্ষিণভারতে পর্ত্তু-গীজ যাজক-দস্যুদিগের নামে লোকের ঘোর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! পর্ত্তুগীজগণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এদেশে বেশ সমৃদ্ধি

সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এমন কি, মহাবেতংখাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, রাজকুমার সাজাহান ও সাহায্যাভিলাষে তৎকালীন হুগলীর পর্ত্তুগীজ গবর্ণর মাইকেল বড্রিগ (Michael Bedriguos) সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ গবর্ণর তাহাতে অসম্মত হইয়া, তাঁহাকে রাজদ্রোহী প্রভৃতি কটূক্তিতে আপন অসম্মতি জানাইয়া পাঠাইলেন। সেই ক্রোধে রাজ্যপ্রাপ্তির অনতি পরেই বাদসাহ সাজাহান একদল সৈন্য পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। তিনমাস ব্যাপী অবরোধের পর-পর্ত্তুগীজদিগের প্রায় সহস্রাধিক হত ও পাঁচ সহস্র স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকা মুসলমান হস্তে বন্দী হইয়া, দিল্লীতে প্রেরিত হইল। সে সময় পর্ত্তুগীজদিগের গঙ্গা-বক্ষস্থ তিনশত জাহাজের মধ্যে কেবল মাত্র তিন খানাই পলায়ন করিতে পারিয়াছিল। বন্দীদিগের মধ্যে যে সমস্ত সুন্দর বালক ও যুবক ছিল, মুসলমানগণ তাহাদিগকে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। যুবতী ও বালিকাগণকে রাজপরিবার ও মোগল ওমরাওগণ আপনাদের বিলাস বস্তু রূপে আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইলেন। এই পর্ত্তুগীজ-পরাজয়ের পরেই বঙ্গের রাজধানী সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে আনীত হইল। তদবধিই হুগলী অতি সমৃদ্ধিশালী নগর। হুগলীর প্রধান দৃশ্যের মধ্যে ইমাম বাড়া অতি মনোহর। ইমাম্ বাড়া মসজিদের প্রাচীরগাত্রে

কোরাণের শ্লোকে চিত্রিত। সম্মুখস্থ আঙ্গিনার মধ্যস্থলে একটি কৃত্রিম ফোয়ারা, তাহার জলে লাল মাছগুলি অনবরত ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

ইমাম বাড়ী।

হুগলীর ইমাম বাড়ী সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, অনেক দিন হইল হুগলীতে একজন ধনাঢ্য মুসলমান বাস করিতেন। তিনি দুইটি বিবাহ করিয়া, তাহাদের গর্ভে এক সুকুমার পুত্র ও এক সুকুমারী কন্যারত্ন লাভ করিলেন। পুত্রের নাম মহম্মদ মহিসিন ও কন্যার নাম মুন্না। পিতার জীবিতাবস্থায়ই মুন্না সালিউদ্দীন নামে জনৈক বিলাসী মুসলমান যুবকের করে অর্পিত হইলেন। মুন্নার অনুপম রূপ রাশিতে অথবা তাঁহার পবিত্র প্রেমে সালিউদ্দীন মুগ্ধ ছিলেন না; বালিকা যে, পিতার নিকট হইতে বিপুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার প্রলোভনই বিলাসী যুবকের মুন্নাকে বিবাহ করিবার একমাত্র কারণ। বালিকা কিন্তু বিবাহের পর হইতেই, স্বামীতে মুগ্ধ। বিলাসীর হস্তে বিপুল সম্পত্তিরও স্থায়ীত্ব অল্প সময়ের জন্য। সালিউদ্দীন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বালিকার যথা সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিলেন। ক্রমে বালিকার অলঙ্কারণেও স্বামীর

চক্ষু পড়িল। সাধ্বী বালিকা অম্লান চিত্তে আপনার অলঙ্কারণ সমুদয় দান করিয়া ও স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে ক্রটী করিলেন না। কিন্তু এ গভীর প্রেমের পরিবর্ত্তে স্বামী তাঁহাকে কি দিয়াছেন? ঘৃণা, অপমান, ক্রুর ব্যবহার ভিন্ন বালিকা এপর্য্যন্ত স্বামীর নিকট হইতে কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। এমন কি, সেই পরমসুন্দরী বালিকার মর্ম্মনিঃসৃত চক্ষুজল মূর্খক্তের জন্যও পাষণ্ডের হৃদয় দ্রব করিতে পারিল না। সম্পত্তি রাশির অপব্যয় হইলে পর, সালি-উদ্দিনের সেই পাষণ্ড ভাব আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এখন পাপাত্মা, সেই সরলা পতিপরায়ণা বালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া, আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। মুন্না বুঝিয়াছেন, সংসারে তাঁহার সুখশান্তি ফুরাইয়াছে। স্বামীর সুখ সাধনে, স্বামীর মঙ্গল কামনায়ই তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। রমণীরত্ন মুন্না সালিউদ্দিনের পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহে কোন আপত্তি করিলেন না; কেবল মাত্র, স্বামীর পদতলে পড়িয়া এই শেষ ভিক্ষা চাহিলেন যে, বিবাহের পর যেন তিনি প্রতি-দিন বারেক মাত্র স্বামীকে দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহে স্থান প্রাপ্ত হন। নিষ্ঠুর স্বামী ইহাতে কর্ণপাত ও করিলেন না। মুন্নাকে অতল দুঃখ, ভীষণ দরিদ্রতায় ডুবাইয়া, অন্য এক আঢ্য মুসলমানের কন্যাকে বিবাহ করিলেন ও তথায় বিলাস এবং আমোদে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

মহম্মদ মহিসিন পিতার নিকট হইতে যে সম্পত্তি লাভ

করিয়া ছিলেন; তাহা লইয়া বাণিজ্যে চলিয়া গিয়াছেন স্বামীপরিত্যক্তা মুন্না একাই পিতৃগৃহে অবস্থান করিয় আপন অদৃষ্টফল ভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় জাহা খাঁ নামক অন্য এক জন আঢ্য মুসলমান মুন্নার পাণি গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সতী, সাধ্বী ললনা মাত্রেরই অদ্বৈত চিন্তা, অদ্বৈত প্রেম। এক স্বামী ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষে তাহাদের প্রেম, ভক্তি বিন্যস্ত হইতে পারে না। স্বামীস্ত্রীর প্রেম অদ্বৈতভাবময় বলিয়াই উহা এত মধুর, এত গভীর, এত উন্মত্ততায় পূর্ণ। মুসলমান বালিকা হইয়াও মুন্না এই প্রস্তাবে দারুণ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন। যে স্ত্রীলোক স্বামী সহায় হইতে বঞ্চিত, সংসারে তাহার ন্যায় আশ্রয়হীন জীব আর দ্বিতীয় নাই। সেই সময় বঙ্গের যবন রাজত্ব অরাজকতায় পরিপূর্ণ। জাহা খাঁ মুন্নাকে সবলে বিবাহ করিবার বাসনায়, তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেন। ঈশ্বর সতীর সহায়—তাঁহার রক্ষা-হস্ত আর্ত্ত-রক্ষায় প্রসারিত; দুরাত্মা জাহা খাঁর হস্ত হইতে মুন্না একজন সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারিলেন। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, জাহা খাঁর দলবল গৃহের নিতান্ত হীন দশা করিয়া রাখিয়াছে। তদ্দর্শনে মুন্নার হৃদয়ে বিষম বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। মুন্না স্বামী দেখিবার বাসনা তখন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি যেন চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বামীগৃহে

যাইয়া, সবিনয়ে সপত্নীর পদ যুগল ধরিয়া, তাহার আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলেন। স্বপত্নী কি স্বামীর হৃদয়. ইহাতে বিন্দু মাত্র ও আর্দ্র হইল না। বরং নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহারা মুন্নাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিলেন। স্বামী-আশ্রয় হারাইয়া. মুন্না ভাবিলেন, তিনি আর মানব-আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিবেন না। জগত পিতার বিশ্বব্যাপী আশ্রয়ে জীবন ধারণ করিবার আশায় তিনি যৌবনেই যোগিনী সাজিয়া, পথের ভিখারিণী হইলেন। মহিসিন এই সময়ে বাণিজ্যে সম্পত্তি রাশি জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া দেখেন রাজ প্রাসাদ শ্মশানে পরিণত। প্রাণাধিক ভগিনী গৃহে নাই। তিনি সমস্ত অবগত হইয়া, ভগিনীর অন্বেষণে নির্গত হইলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাকে ভিখারিণী বেশে দেখিতে পাইয়া, ভ্রাতার চক্ষু হইতে দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—একবারে মুন্নাকে যাইয়া হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন। উভয়ের হৃদয়ের বেগ প্রশমিত হইলে, মহিসিন বলিলেন "মুন্না চল গৃহে যাই। এ দারুণ সংসারে দুই ভাই ভগিনী থাকিয়াই আপন অদৃষ্ট ফল উপভোগ করিব।" মুন্না আর সংসারে ফিরিতে চাহিলেন না। সেই সময় মহিসিন মুন্নাকে পিতৃ প্রদত্ত এক খানা কবচ প্রদান করিলেন। তাহা খুলিয়া দেখিলেন তাহাতে এক খানা দান পত্র রহিয়াছে। পিতা মৃত্যু কালে মুন্নাকে আরো বিপুল অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। মহিসিন সেই অর্থে আবার

সংসার করিবার জন্য ভগিনীকে গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীরত্নে যে নারী বঞ্চিত, সংসারের বিপুল ধনরাশি তাহার নিকট তুচ্ছ। মুন্না আর গৃহে ফিরিবেন না। মহম্মদ মহিসিন ও সেই অর্থে হুগলীর ইমামবাড়া নির্ম্মাণ করিয়া ও মহম্মদ মহিসিন নামে কতকগুলি বৃত্তি স্থাপন করিয়া, ভ্রাতৃস্নেহের উচ্চতম দৃষ্টান্ত দেখাইতে, ভগ্নীর সহিত সংসারে ফকির সাজিলেন। মহম্মদ মহিসিন প্রদত্ত বৃত্তি এখন ও মুসলমান ছাত্রগণ পাইয়া আসিতেছে। সেই অর্থে বঙ্গের অনেক মাদ্রাসা (বিদ্যালয়) ও মাচোয়ারী মুসলমান দিগের শিক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সপ্তগ্রাম—ত্রিশ বিঘা ষ্টেষণের অপর প্রান্তে অবস্থিত। অতি পূর্ব্বে এস্থানের শোভা, সমৃদ্ধি রোমানদিগকে পর্য্যন্ত বিস্মিত করিয়া ছিল। কিন্তু আজি তাহার কিছুই নাই, আজি প্রায় সমুদয় স্থানই অরণ্যে আবৃত। সেই অরণ্যের মধ্য দিয়া একটী প্রশস্ত পথ সরস্বতী অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। সেই অরণ্য মধ্যে, একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন, অমর পূর্ব্ব সমুয়ের আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম তল বাহিয়া, সরস্বতী প্রশস্ত মূর্ত্তিতে সাগরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছিল। বিদেশীয় বণিকগণ তদবলম্বনেই সমুদ্রবক্ষ হইতে বঙ্গে পড়িয়া আপনআপন বাণিজ্যাবাসে উপনীত হইতেন। আজি সরস্বতী ও একটী সামান্য খালের ন্যায় মৃতপ্রায়—পূর্ব্বগৌরবের চিহ্নস্বরূপ

একটী মগ্নজাহাজের মাস্তুল আজিও উহার গর্ভে পরিলক্ষিত হইতেছে। সপ্তগ্রামে পোড়ামুখ হনুমান বৃন্দের বেশ প্রাদুর্ভাব দেখিলাম।

পাণ্ডুয়া—অতি পূর্ব্বকালে বঙ্গের হিন্দুরাজাদিগের রাজধানী ছিল। পাণ্ডুয়াতে "গোবধ" লইয়া হিন্দু মুসলমানের এক তুমুল সংগ্রাম হয়। এখনও কৃষকগণ, নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্র সমূহে, চাষ করিবার সময় সেই যুদ্ধনিহত নরদেহের রাশিরাশি চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পাণ্ডুয়ার কোন হিন্দু-রাজার দীর্ঘকাল যাবৎ সন্তান না হওয়াতে রাজা ও রাজমহিষী বড় দুঃখিত ছিলেন। দীর্ঘকাল পরে, তাঁহাদের একটী সন্তান হইলে পর, রাজা নগরবাসীদিগকে আমোদআহ্লাদ উপভোগ করাইবার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিলেন। সেই সময় রাজার একজন পারস্য পণ্ডিত পাণ্ডুয়াতে অবস্থান করিতে ছিলেন। সেই মুন্সীজী রাজকুমারের জন্মজনিত এই মহা আমোদ উপলক্ষে গোমাংসের লোভ কোন মতেই সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি গোপনে একটী গোহত্যা করিয়া, যতদূর পারিলেন তাহা উদরস্থ করিলেন ও ভুক্তাবশিষ্ট অস্থি চর্ম্ম গুলি মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিলেন। রাত্রিতে উহা শৃগাল কর্ত্তৃক খোদিত হইয়া, তৎপর দিবস সর্ব্বজন সমক্ষে বাহির হইয়া পড়িল। হিন্দু রাজ্যে হিন্দুর পূজ্য, পবিত্র গো হত্যা! নগর বাসী সকলেই ক্রোধে আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। যে শিশুর জন্মোপলক্ষে রাজ্যে গোহত্যা হইয়াছে, অশুভ ভাবিয়া

বর্দ্ধমান—সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বেই আমাদের গাড়ী আসিয়া, বর্দ্ধমানে উপস্থিত। বন্ধু মহাশয় ওয়ারেণ্ট জারি করিয়া গিয়াছেন—আত্মীয় স্বজন আমাদিকে পরের ট্রেনে ধরিতে আসিবেন। সে ভয়ে শ্রীমান শ—কে বলিলাম "চল আজ বর্দ্ধমানের কোন নির্জ্জন হোটেলে যাইয়া, লুকাইয়া থাকি।" 'তথাস্তু' বলিয়া দুজনেই হোটেল অনুসন্ধানে চলিলাম। পরে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ন্যায়, সহরে যাইয়া, এক নির্জ্জন গলীর মধ্যে একটী হোটেল আবিষ্কার করিলাম। সেস্থান হইতে আমাদিগকে যে, কেহ সহজে বাহির করিতে পারিবে এরূপ বোধ হইল না। ব্যবসাদারী ফলাইবার জন্যই হউক, অথবা আমাদিগের প্রতি তাহার একটুকু অস্বাভাবিক মায়া, দয়া হইয়াছিল বলিয়াই হউক, হোটেলকর্ত্তা আমাদিগকে দেখিয়াই, ঝিকে অনুমতি করিলেন "ঝি, এ চাঁদ পানা বাবু দুটীর জন্য আজ ভাল খাবার তৈয়ার কর।" এখন আমরা চাঁদ পানা হই আর না হই, হোটেলকর্ত্তার এরূপ সম্ভাষণে আমরা পরম অনুগৃহীত হইয়াছিলাম। বাস্তবিকও হোটেলস্বামীর অনুগ্রহে, সে দিন আমাদের খাওয়া দাওয়ার কিঞ্চিৎ ভাল বন্দোবস্তই হইয়াছিল।

অতি পূর্ব্বে আমরা একবার বর্দ্ধমান পরিদর্শন করিয়াছি। তাহাতেই এখন আর বর্দ্ধমান দেখার বিশেষ সাধ নাই। বিশেষতঃ গ্রেপ্তারের ভয়েই সে সময় আমরা

নিতান্ত জড়সড়। বর্দ্ধমান পাঠকবর্গের বিশেষ পরিচিত; কাজেই তৎসম্বন্ধে অতি সংক্ষেপ বিবরণই আমরা পাঠকবর্গকে জানাইলাম। বর্দ্ধমান অতি পরিষ্কৃত সহর। রাস্তাগুলির দুপার্শ্বেই রাশিরাশি গাছ। বর্দ্ধমানে পুকুরের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব। তথায় বিদ্যাসুন্দরের সমসাময়িক বিশেষ চিহ্ন কিছুই এখন পরিলক্ষিত হয় না। তবে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের প্রায় এক মাইল দূরে "বিদ্যাপাটী" নামে একটী স্থান এখনও বিদ্যার বাড়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহাতে সুড়ঙ্গের একটুকু চিহ্ন কোন সময়ে নাকি পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু ইহাই সেই বিদ্যার বাড়ী কিম্বা এই সুড়ঙ্গই সুন্দরের সুড়ঙ্গ কিনা তাহা ভগবান জানেন। সুন্দর ও মালিনী মাসীর বাসস্থান কোন প্রত্নতত্ত্ববিদই এখন পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বর্দ্ধমানে মান সরোবর নামে এক জলাশয় ও একখানি কালী মূর্ত্তি আছে, তাহাই বিদ্যা-সুন্দরের সমসাময়িক সরোবর ও মশানের কালী মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমানের আধুনিক দৃশ্যের মধ্যে কৃষ্ণ সাগর, গোলাপ বাগ ও রাজ ভবনই প্রধান। কৃষ্ণ সাগরের চারি পাড় এত উচ্চ যে, জলাশয়টী দুর্গ বন্ধ বলিয়া বোধ হয়। সে সমস্ত তীরে অনেকগুলি কামান পড়িয়া আছে। গোলাপ বাগের এক প্রান্তে একটী প্রাণীবাটিকা। ইহার মধ্যস্থলে একটী সুন্দর পুকুর। পুকুরের তীরে এক ক্ষুদ্র রাজভবন। উদ্যানের একস্থানে মহারাজের এক প্রিয় কুকুরের সমাধি

বিরাজমান। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবংশ বিদ্যাসুন্দরোক্ত মহারাজা বীরসিংহের বংশধর নয়। উহারা লাহোর হইতে বঙ্গে আসিয়া, কোন সম্বন্ধ সূত্রে বর্দ্ধমানের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন।

মুসলমান রাজত্ব কালে বর্দ্ধমানও এক সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল। ভুবন-বিখ্যাত নুরজাহানের ভূত-পূর্ব্ব স্বামী বীরপুরুষ শেরআফগানের বীর-দেহ বর্দ্ধমানে সমাধিস্থ থাকিয়া আজিও যেন তাঁহার অদ্ভুত বীরত্বের কথা লোকের মনে জাগাইয়া দিতেছে। জাহাঙ্গীর কিরূপ অসদুপায় অবলম্বনেও শেরআফগানের প্রাণ সংহার করিতে না পারিয়া, শেরসাহাকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন ও নানা উপায়ে সেই বীর পুরুষের সংহার সাধন করিয়া, অনুপম রূপময়ী নুরজাহানের পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন ইতিহাসেই তাহা সম্যক চিত্রিত রহিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

রাত্রিতে আহার সমাপন করিয়াই আমরা ডাক গাড়ীর আশায় আবার ষ্টেষণে চলিয়া আসিলাম। পাছে ডাক গাড়ীতে বীর-কুলর্ষভ বন্ধু মহাশয় আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আসেন, এই ভয়ে ষ্টেষণেরি যে স্থানে খুব ভিড় সেই স্থানে যাইয়া, গাড়ীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি ১২টা কি ১টার সময় ডাক গাড়ী আসিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত। আমরা আগেই টিকিট করিয়াছি। গ্রেপ্তারের ভয়ে চুপি চুপি যাইয়া

এক খানা গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম। যতক্ষণ গাড়ী ষ্টেষণে ছিল, ততক্ষণ আমাদের মনে কত ভয়, কত সন্দেহ। পরে বংশী ধ্বনিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, আমরা মনে মনে বলিলাম "এখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক, গণেশ আসিলেও আমাদিগকে আর ধরিতে পারিবে না।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কানুড়সন—তিনপাহাড়—রাজমহল—মোকামা—
মোগলসরাই—রাজঘাট।

বর্দ্ধমানের পরই শ্রীমান কানুজংসন ষ্টেষণ; সেখান হইতে লুপলাইন ও কর্ডলাইন ঝগড়া করিয়া, দুই দিক অবলম্বনে আবার লক্ষীসরাইতে যাইয়া সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছে। আমরা কানুজংসনের টিকিট করিয়াছিলাম, সেখানে গাড়ী পৌঁছিলে, আমরা নামিয়া বিশ্রাম ঘরে (Waiting Room) যাইয়া অবস্থান করিলাম। বিশ্রাম ঘরে আর দ্বিতীয় কাক প্রাণী নাই, দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড মাঠ, ঘরের সম্মুখ দিকটা সম্পূর্ণ খোলা থাকাতে "শো শো" শব্দে হাওয়া আসিতেছিল। আমরা গভীর রাত্রিতে, অন্ধকারময় বিশ্রাম ঘরে এক এক খানা টুলের উপর শুইয়া, কতক্ষণ পর্য্যন্ত, জীবনের সুখ দুঃখ

পাড়িয়া গল্প করিলাম। পরে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িলাম।

পর দিবস ২০শে জুলাই (৬ই শ্রাবণ)। আমরা প্রাতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া আসিলাম। বেলা ৯টার সময় লুপ-লাইনের গাড়ী আসিবে। ইতিমধ্যে আমরা বাজারে যাইয়া আমাদের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইলাম। পরে সকাল সকাল আহার করিয়া, গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ৯টার সময় লুপলাইনের গাড়ী আসিলে, আমরা রাজমহলের টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী আমাদিগকে লইয়া ছুটিয়া চলিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা তিন পাহাড় ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত। সেখান হইতে অন্যগাড়ীতে আমাদিগকে রাজমহল যাইতে হইবে। দেশ ভ্রমণে কি সুখ, দেশ ভ্রমণে মানুষের মন, প্রাণ কিরূপ খুলিয়া যায়, তিন পাহাড়ে আসিয়াই আমরা তাহার কতকটা আভাস উপভোগ করিতে পারিলাম। তিন পাহাড়ের দৃশ্য বড় সুন্দর! পাহাড় কাটিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ষ্টেষণটী একটুকু উচ্চ স্থানে অবস্থিত। বাস্তবিক ও সে স্থানের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া, আমরা এক নূতন সুখভোগ করিয়াছিলাম।

তিনপাহাড় হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলপথ আছে। সে স্থানে কতকক্ষণ অবস্থানের পরই আমরা অন্য গাড়ীতে রাজমহল রওনা হইলাম। যাওয়ার সময় অনেক

মাঠ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। গাড়ীতে বসিয়াই সে সুবিস্তীর্ণ মাঠ সমূহের যে, কি সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা স্মৃতি হইতে কখনও দূর হইবার নয়। সন্ধ্যা না হইতেই আমরা রাজমহলে আসিয়া পৌঁছিলাম।

রাজমহল বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সুলতানসুজা কর্ত্তৃক নানাবিধ হর্ম্ম্য-মালায় ভূষিত হইয়াছিল। এক সময় যবন-রাজ-প্রসাদে এস্থানে শোভা, সৌন্দর্য্যের অবধি ছিল না ; এক সময় রাজমহল দিল্লীর সমকক্ষ সহর ছিল ; কিন্তু আজি তাহার কিছুই নাই, কালের অনন্তস্রোতে তাহা ধুইয়া গিয়াছে। দু একটী ভাঙ্গা মসজিদ ভিন্ন রাজ মহলে মুসলমান রাজধানীর বিশেষ কিছু চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইলাম না। তবে সহরের দক্ষিণ ভাগে ও গঙ্গাতীরে ভগ্ন প্রাচীর ও ভগ্ন মন্দিরেরও একটুকু চিহ্ন এখনও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত গুলির অধিকাংশই রেলপথ প্রস্তুতার্থে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। রাজমহল ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। একটী ধূসর বর্ণের প্রকাণ্ড পাহাড়, দীর্ঘকাল যাবত গঙ্গাতীরে বাস করিয়া, উন্নত মস্তকে সাগর-গামিনী গঙ্গা দর্শন করিতেছে। গঙ্গাতীরে আসিয়া, পাহাড়ের সে মনোহর দৃশ্য দর্শনে আমরা এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া কেবল তাহাই দেখিতে লাগিলাম। পরে বাজারের নিকট আসিয়া, খাইবার ও থাকিবার বন্দোবস্ত করিলাম। রাজমহল সাঁওতাল পরগণার একটী সবডিভিষণ। ইহাই

বাঙ্গালা ও বেহারের সঙ্গম স্থান। রাজমহলের লোক আধা বাঙ্গালা ও আধা হিন্দি মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাষার কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। তাহাদের আচার, ব্যবহারও মিশ্রিত প্রণালীর। লোক গুলি নিতান্ত অশিক্ষিত; ভদ্র সম্প্রদায় সেখানে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাজমহল দেখিলাম। পেটুকের পক্ষে সুখবর, সেখানে ইলিশমাছ পাওয়া যায়। রাত্রিতে ইলিশমাছ সংযোগে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া, আহারান্তে আমরা এক দোকান ঘরে শয়ন করিয়া, নিদ্রা গেলাম।

২২ শে জুলাই (৮ই শ্রাবণ) রাত্রিতে আহারান্তে আমরা আমাদের বাসস্থান হইতে রাজমহল ষ্টেষণে চলিয়া আসিলাম। ষ্টেষণে আসিয়া রাত্রি ১॥ টা পর্য্যন্ত আমাদিগকে গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইল। রাজমহল ছাড়িয়া আমরা কোথায় যাইব, তখন পর্য্যন্তও স্থির হয় নাই। ভায়াতে আমাতে নানা তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিলাম, দ্বারভাঙ্গা, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া, নেপালের দিকে চলিয়া যাইব, পোড়া বাঙ্গালা দেশের আর ধার ধারিব না। নেপালের দিকে যাওয়াই স্থির করিয়া, আমরা "বারেঘাট" ষ্টেষণের টিকিট করিয়া লইলাম; সেখান হইতে আমাদিগকে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়েতে দ্বারভাঙ্গা যাইতে হইবে। রাত্রি ১॥ টার সময় গাড়ী আসিয়া ষ্টেষণে উপস্থিত। সাঁওতাল যাত্রীদিগের মধ্যে একটা রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গেল।

আমরা ষ্টেষণে পড়িয়া ঘুমাইতেছিলাম, তাহাদের বিকট কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া গাড়ীতে যাইয়া বসিলাম। গাড়ী আমাদিগকে লইয়া, আবার তিন পাহাড়ে উপস্থিত; তিন পাহাড়ে গাড়ী বদল করিয়া, আমরা পশ্চিমে রওনা হইলাম। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু আর ভাল ঘুম হইল না; রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মীসরাই অতিক্রম করিয়া, আমরা মোকামাতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এস্থান হইতে অন্য গাড়ী আমাদিগকে বারেঘাট লইয়া যাইবে। মোকামা একটী বড় দরের ষ্টেষণ। আমরা বিশ্রাম করিবার জন্য এক সরাইতে আশ্রয় লইলাম। সকাল সকাল মুখ হাত ধুইয়াই, স্নানের উদ্যোগ করিলাম। সে দেশে কুয়াই জলের এক মাত্র আশ্রয়। কুয়ায় পড়িবে ভয়ে, ভায়াকে সরাইতে রাখিয়া আমি স্নানের জন্য একটী কুয়ার উদ্দেশে চলিলাম। নিকটেই একটী ভাল কুয়া রহিয়াছে। কিন্তু এত গভীর কুয়া হইতে জল পাই কেমন করিয়া? সে দেশী একজন ব্রাহ্মণকেই জল তুলিয়া দিতে নিযুক্ত করিলাম। ব্রাহ্মণ আমাদের নিকট লোক পিছে দুই পয়সা করিয়া দর সাব্যস্ত করিল। 'এক এক জনের স্নানের জল তুলিয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে দুই পয়সা করিয়া মজুরী দিতে হইবে।' এত আর কলিকাতা নয় যে, কল টিপিয়াই তাহার নিচে মাথা পাতিয়া দিব? আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই স্নানের দক্ষিণা স্বরূপ এই 'কুয়াসেলামিটা' দিতে হইল। ব্রাহ্মণ জল তুলিয়া দিতেছে, আর আমিও জলের

পর জল ঢালিয়া, দুই পয়সার দাম আদায় করিয়া লইতোছিল। পরে ভয় হইল, বিদেশে পয়সার দাম আদায় করিলে, পাছে অসুখ করে, এইভয়ে অল্পেই গরিব বেচারাকে নিষ্কৃতি দিলাম। সরাইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, একটী বৃদ্ধা ভায়ার নিকট বসিয়া, তাহার সহিত আলাপ করিতেছেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাড়ী মালদহ, এক মাত্র বিধবা কন্যার সহিত এখন মথুরা বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীমান শ—বলিল "বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ কন্যা তাহার নিকট বসিয়া, কত আক্ষেপে বলিতে ছিলেন যে, ভায়ার মত তাঁহার একটী জামাই ছিল; 'জামাইটীর মৃত্যুর পর এক মাত্র বিধবা কন্যাকে লইয়া, তিনি তীর্থ দর্শনে যাইতেছেন।' শুনিয়া ভায়াকে সস্নেহে আশীর্বাদ (Congratulation) না করিয়া,থাকিতে পারিলাম না। বৃদ্ধা ভায়ার নিকট আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভায়ার সংসারে বৈরাগ্য দেখিয়া, উদাস পূর্ণ উত্তর শুনিয়া, তিনি আমাদের জন্য বড় স্নেহ প্রকাশ করিলেন। তিনি বৃদ্ধ স্বভাব-সুলভ স্নেহ পরবশ হইয়া,পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "বাছারে, মা বাপ তোদের কি করে ছেড়ে দিয়েছেরে?" আমরাই যে মা বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, তিনিত আর তাহা জানিতেন না? আমি স্নান করিয়া আসিলে, ভায়াও স্নান করিতে চলিয়া গেল। ইত্যবসরে বৃদ্ধা আমার নিকট বসিয়াও তাঁহার শোক দুঃখের অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার বিধবা কন্যাকে

আর এক বার দেখিতে পাইলাম। আমাদের হৃদয় কর্কশ, আমরা অপদার্থ, তাহাতেই সে সময় সে বাল-বিধবাকে দেখিয়া, মনে মনে বলিয়াছিলাম—"স্বামী মরিয়া নিতান্ত সুবুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছেন।" সংসারই সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী, সুন্দরের জন্যই লোকের মায়া, দয়া, সহানুভূতি; পাঠক, আমাদের এ অপরাধ টুকু মাপ করিবেন। বৃদ্ধার মার মত স্নেহ দেখিয়া, তাঁহার স্নেহ বাক্যগুলি শুনিয়া, তখন তাঁহাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার সহিত কতক্ষণ আলাপের পরই ভায়া স্নানান্তে ফিরিয়া আসিল। পরে কিঞ্চিৎ লুচি তরকারী খরিদ করিয়া, আমরা উদর-দেবের সৎকার করিলাম। পাঠক বর্গের মধ্যে যাঁহারা লুচির ভক্তদাস, তাঁহারা শুনিয়া আপ্যায়িত হইবেন যে, এখানে তিন আনা দরে বিশুদ্ধ ঘিয়ে ভাজা লুচি পাওয়া যায়। আমরা আহার করিয়া, একটুকু বিশ্রাম করিলাম। কুয়ার জলের এমনি তেজ যে, কতক্ষণ বিশ্রামের পরই আবার আমাদের ক্ষুধা পাইয়াছে। এবারও আমরা অর্দ্ধ সের পরিমিত লুচি ও তরকারী যোগে লুচির "খোঁয়ারি" ভাঙ্গিয়া লইলাম।

১২টার পরে কলিকাতার গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। আমরা সে গাড়ীতে চাপিয়া "বারে ঘাট" রওনা হইলাম। মানুষের মন চঞ্চল, গাড়ীতে বসিয়াই আমাদের মতি বুদ্ধি ফিরিয়া গেল। মনে ভাবিলাম পশ্চিমে এত ভাল ভাল স্থান থাকিতে নেপালের জঙ্গলে মরিতে যাইব কেন? মনের কোন ভিতরকা—

[illegible] দেশ ছাড়িয়া "ছাতুখোরের" দেশেইবা ঢুকিব কেন? দূরহোক, নেপাল যাওয়ার আশা আমরা একবারে ছাড়িয়া দিলাম। অবশেষে বেনারস্ যাওয়াই আমাদের স্থির হইল। বারে ঘাট ষ্টেষণ পার হইয়াই অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া, আমরা বেনারসের টিকিট করিয়া লইলাম। পরে পাটনা, বাঁকিপুর, দানাপুর, আরা ও শোন নদীর বিখ্যাত সেতু ইত্যাদি কত কি পার হইয়া, রাত্রি ১ টার সময় মোগল সরাই আসিয়া পৌঁছিলাম। গাড়ী আমাদিগকে মোগল সরাইতে "ষ্টেষণ বাস" দিয়া, রস্তা প্রদর্শনে গর্ব্ব ভরে এলাহাবাদের দিকে চলিয়া গেল। আর একখানা গাড়ী খুব স্নেহশীল, আমাদিগকে নেহেত স্নেহপ্রকাশে ব্রীজ ঘাট লইয়া চলিল। রাত্রি প্রায় ২টার সময় আমরা রাজঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখান হইতে নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া, আমাদিগকে বেনারস যাইতে হইবে। রাত্রিতে কিঞ্চিৎ লুচি যোগ করিয়া, আমরা অবশিষ্ট রাত্রির জন্য এক সরাইতে ডেরাডাণ্ডা ফেলিয়া নিদ্রা গেলাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

বারাণসী বা কাশী।

২৪শে জুলাই (১০ই শ্রাবণ) অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমরা গঙ্গা পার হওয়ার উদ্যোগ করিতেছি। তখন বর্ষাকাল, জাহ্নবী পূর্ণ যৌবনে ভরাপূরা, পঙ্কিল জল রাশি আবর্ত্তনে ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্নদিকে চলিয়া যাইতেছে। অনেক ছোট মাঝী আমাদিগের নিকট সহস্র মুখে আপন আপন নৌকার জীবন চরিত ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে নৌকায় তুলিতে যত্ন করিল। নৌকা গুলি রূপে গুণে নিতান্ত কদর্য্য; মাঝিরা কিন্তু তাহাদের নৌকার ব্যাখ্যাছলে তাহা জাহাজ নামে পরিচিত করিতেও ত্রুটী করিল না। অন্যান্য যাত্রী-দিগের সহিত আমরাও একখানা নৌকায় উঠিয়া; বেনারস উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। নৌকাখানা মদখোর মাতালের ন্যায় আমাদিগকে লইয়া, ঝুলিতে ঝুলিতে গঙ্গা বাহিয়া চলিল। কতক দূর আসিয়াই আমরা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি বারাণসীর বঙ্কিম মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। গঙ্গা বক্ষ হইতে বারাণসীর দৃশ্য বড় মনোহর। নানা প্রকার সচূড় হর্ম্ম্য-মালায় শোভিত থাকিয়া, আর্য্য তীর্থক্ষেত্র বারাণসী জাহ্নবী সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। বারাণসীর দৃশ্য দেখিয়া

আমাদের হৃদয় এত লালায়িত হইয়াছিল যে, যদি তখন ত্রেতা যুগের মহাবীরের ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতাম, যদি তখন উল্লম্ফন মন্ত্রে দীক্ষিত থাকিতাম, নৌকার মস্তকে পদাঘাত করিয়া, এক লম্ফেই কাশী যাইয়া পৌঁছিতাম। কিন্তু তাহা হইল কৈ? ক্রমে লালসা-পীড়িত হইতে হইতে, প্রায় ৯টার সময় আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। ঘাটে পৌছিয়াই মাঝিকে ভাড়া দিয়া তীরে উঠিলাম। একটী ব্রাহ্মণ আমাদের নানা প্রকার জয় গান করিতে করিতে, আমাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি "গঙ্গা পুত্র"। শান্তনু গৃহিণী গঙ্গা যে অষ্ট বসু উদ্ধারার্থে আপনার সাত পুত্রকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ইনি কি তাহারই এক জন না, স্বয়ং ভীষ্ম দেব আবার এইরূপে কাশীতে উদয় হইয়া, গঙ্গা পুত্র নামে পরিচয় দিতেছেন, আমাদের মনে তখন এই সন্দেহই ক্রীড়া করিতে লাগিল! অবশেষে কাশীবাসী বাঙ্গালীদের নিকট শুনিলাম, কতগুলি ব্রাহ্মণ আপনাদিগকে গঙ্গা পুত্ররূপে পরিচয় দিয়া, যাত্রীদিগের নিকট হইতে বেশ আদায় করিয়া থাকে। আমরা বাঙ্গালী টোলার কুকুর গলীতে (কাশীর লোক ইহাকে কাওয়াল গলী বলিয়া থাকে) এক জন আত্মীয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তিনি সেখানকার একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। গঙ্গা পুত্র তাঁহার বাসা পর্য্যন্ত আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া, আমাদিগের নিকট হইতে

কিন্তু আদায় করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। আমরা কিন্তু গঙ্গাপুত্র মহাশয়কে একটী পয়সা দিয়াও, পয়সাটী গঙ্গা জলে ফেলিলাম না। গঙ্গাপুত্র মহাশয় প্রথম মিষ্ট বাক্যে, পরে কিঞ্চিৎ কটু বাক্যে, বাক্য বিন্যাসের যথেষ্ট ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া, আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন; পরে বিফল মনোরথ হইয়া, একটী নাতি-শীতোষ্ণ নিশ্বাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও ভীষ্মদেবের হস্ত হইতে পরম নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।

বারাণসীর প্রকৃত নাম কাশী। পুরাণ ও মহাভারত ইত্যাদি ভারতগ্রন্থে আর্য্য ধর্ম্মক্ষেত্র বারাণসী এই নামেই অভিহিত হইয়াছে। কাশীর উত্তরে বরুণা ও দক্ষিণে অসী প্রবাহিত। তজ্জন্যই কাশীর নাম বরুণাসী অথবা বারাণসী, এখন ইংরেজীগ্রন্থ হইয়া "বেনারিস"। ক্ষত্রি-বিদ্যা কর্ত্তৃক কাশী প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তাঁহার সময় নির্ণয় করা সুকঠিন। এই কাশীই আর্য্যজাতির, আর্য্যধর্ম্মের এক প্রকাণ্ড লীলা-ভূমি। এ স্থানে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি কত আর্য্যধর্ম্মের একের পতনে অন্যের উত্থান, অন্যের উত্থানে একের পতন হইয়া ধর্ম্ম জগতের কত লীলা খেলা হইয়া গেল। এ স্থানে কপিল, বুদ্ধ, শঙ্কর, পরেশ নাথ, ভাস্কর প্রভৃতি কত মহামহোপাধ্যায় ভারতী উপস্থিত থাকিয়া, আপন আপন প্রতিভা বলে মর্ত্ত্য জগতকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন। এ স্থানেই আর্য্য মস্তিষ্কের চরম উৎ-

তাঁহাকে শীঘ্রই শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ (Suffocated) হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত (গঙ্গা প্রাপ্ত) হইতে হইত। অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইয়া দেখি, তিনি একখানা দর্ব্বি হাতে দাড়াইয়া আছেন। মহাদেব তাঁহার নিকট দাড়াইয়া "অন্নং দেহিমে জগদীশ্বরি" বাক্যে অন্ন ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। কলিতেও তাঁহার এরূপ পতি ভক্তি দেখিয়া, অন্নপূর্ণার প্রতি বড় ভক্তি হইল; অমনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, মনে মনে বলিলাম "মাগো এখানে তুমি কেবল স্বামীকেই অন্নদান করিতেছ, কিন্তু সমগ্র ভারত যে অন্নাভাবে মারা যাইতেছে, তাহার কি কোন প্রতিবিধান নাই?" তিনি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নন, একজনের কথায় উত্তর না দেওয়া যে, সভ্যতা বিরুদ্ধ, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে কথাটীও কহিলেন না। ইহা ভদ্রতা বিরুদ্ধ (Out of etiquette) ভাবিয়া, আমরা রাগ করিয়া, সেখান হইতে আবার বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে চলিলাম। সেখানে যাইয়া দেখি, একটী কুয়ার নিকট অনেক লোক জড় হইয়াছে। আমরাও কৌতুহল পরবশ হইয়া সেখানে উপস্থিত। এক জন ব্রাহ্মণ আমাদিগকে কতটুকু জল লইয়া, তাহা পান করিতে অনুরোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "ইহা কি?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল "জ্ঞান বাপীর জল।" আগ্রহে হাত পাতিয়া জল লইলাম। মুখের নিকট তুলিয়া দেখি, জগতে ইহা অপেক্ষা দুর্গন্ধময় পদার্থ আছে কিনা সন্দেহ। পেটের ভিতর হইতে অন্নপ্রাশনের ভাতগুলি

পর্য্যন্ত বাহির হওয়ার উপক্রম হইল; বড় ঘৃণা পাইয়া তাহা ফেলিয়া দিলাম। ব্রাহ্মণ আমাদিগকে মতি বুদ্ধি লওয়াইতে বলিল "ইহা জ্ঞান বাপীর জল, ইহা পান করিলে মূর্খও পরম জ্ঞানী হয়, ইহা অবজ্ঞা করিতে নাই, তাহাতে মহাপাপ।" আমরা বলিলাম "বাপু, চিরকাল গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিব তাহাও স্বীকার্য্য, এই পাপে চোদ্দপুরুষ নরকে ডুবাইব তাহাও স্বীকার্য্য, ইহা পান করিয়া আমাদের জ্ঞান লাভের কোন আবশ্যক নাই। এত জ্ঞান কাণ্ড লইয়া, আমরা যার ধন যার কাছে ফিরিয়া যাইতে পারিব না।" জ্ঞান বাপী একটী ছোট রকমের কুয়া; 'শক্ত মরদ' কালা পাহাড়ের হাতে পড়িয়া, ভোলা ঠাকুরকে এ গর্ত্তটীর মধ্যে লুকাইতে হইয়াছিল। আমরা নূতন লোক, এ সমস্ত দেবালয়ে স্ত্রী পুরুষের যেরূপ অসঙ্গত ঘেসাঘেসি দেখিলাম, তাহাতে দেব মন্দিরের প্রতি আমাদের ভক্তি চটিয়া গেল।

২৬শে জুলাই (১০ই শ্রাবণ)—আমরা "বেণীমাধবের ধ্বজা" পরিদর্শন করিলাম। পূর্ব্বে এখানে বেণীমাধব ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; দুর্দ্দান্ত মুসলমানগণ বেণীমাধব ঠাকুরকে সবলে মন্দির চ্যুত করিয়া, ইহা মসজিদ আকারে পরিণত করিয়াছে। মন্দিরের চারি কোণে চারিটী উচ্চ স্তম্ভ (Monument)। আমরা মন্দির রক্ষকদিগকে এক একটী পয়সা দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করিয়া, স্তম্ভে আরোহণ করিলাম। এ স্তম্ভের উপর হইতে বেণারসের শোভা বড়

মনোহর। সেখানে বসিয়া আমরা বেণারসের শোভা দেখি-লাম, গঙ্গার শোভা দেখিলাম, পরে স্তম্ভ হইতে নামিয়া আসিয়া "ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে" দেখিবার জন্য মনিকর্ণিকার ঘাটে চলিলাম।

মণিকর্ণিকা ঘাটে যাইয়া দেখি, মহাপুরুষ একখানা গৃহ ভিত্তিতে বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে কোন কাপড় নাই, বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, মাথার চুল গুলি যেন অল্প কয় দিন হইল কামাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার চুলগুলি নাকি সর্ব্বদাই এরূপ অবস্থায় রহিয়াছে। তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। আমাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। তাঁহার সম্বন্ধে তথাকার লোক আমাদিগকে অনেক অদ্ভুত কথা বলিল; কিন্তু আমরা তাহার কিছুই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাই।

মণিকর্ণিকার ঘাট অতি পূর্ব্বে ঘোর অরণ্যময় ছিল। সেই অরণ্যে বিষ্ণু মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া, আপন কুণ্ডল হইতে একটী মণি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তদবধিই এই স্থানের নাম মনিকর্ণিকা ঘাট। এ স্থানের প্রধান দেবতার নাম ভৈরবনাথ—ভৈরব মুর্ত্তিতে শ্মশানে বসিয়া, প্রকৃতি সংহারে নিযুক্ত! মার্কণ্ডেয় নামক মুনিবর এই মনিকর্ণিকা ঘাটের বর্ণনাছলেই স্বনাম খ্যাত পুরাণে লিখিয়া-ছেন——

শ্মশানং ঘোর সন্নাদং শিবা শত সমাকুলং ।
শব মৌলি সমাকীর্ণং দুর্গন্ধং বহু ধূমকং ॥
পিশাচ ভূত বেতাল-ডাকিনী যক্ষ সঙ্কুলং ।
গৃধ্র গোমায়ু সঙ্কীর্ণং শ্ববৃন্দ পরিবারিতং ॥
জ্বলন্মাংশ বসা পঙ্ক মেদোশৃগ বাত সঙ্কুলং ।
নানামৃত সুহৃন্নাদ মহা-কল্লোল সঙ্কুলং ॥
হা পুত্র মিত্র হা বন্ধো ভ্রাতর্বৎসে প্রিয়েদ্যমে ।
হা মাতর্ভাগিনেয়াশ্চ হা মাতুল পিতামহ ॥
মাতামহ পিতঃ পৌত্র ক্ক গতোস্যেহি হা পতে ।
ইত্যেবং বদতাং যত্র ধ্বনিঃ সংশ্রূয়তে মহান্ ॥
অর্দ্ধদগ্ধাঃ শবাঃশ্যাব বিকসদ্দন্ত পংক্তয়ঃ ।
হসন্তীবাগ্নি মধ্যস্থাঃ কায়স্যেয়ং দশাত্বিতি ॥
অগ্নেশ্চটচটা শব্দো বয়সামস্থি পংক্তিষু ।
বান্ধবাক্রন্দশব্দশ্চ পুক্কসেষু প্রহর্ষদঃ ॥
গায়তাং ভূত-বেতাল-পিশাচগণ-রক্ষসাম্ ।
শ্রূয়তে সুমহাঘোষঃ কল্পান্ত ইব সর্ব্বতঃ ॥*

---

* শ্মশানের শব্দ অতি ভয়ঙ্কর। শত শত শৃগালী লোল জিহ্বায় বিচরণ করিতেছে। শবের মস্তক ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। দুর্গন্ধ ছুটিতেছে।

এই মনিকর্ণিকা ঘাটেই সূর্য্যবংশ ধুরন্ধর মহারাজা হরিশ্চন্দ্র ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট রাজমহিষী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া, চণ্ডালত্ব গ্রহণে মুর্দ্দাফরাস সাজিয়া, বলিয়াছিলেন ;——

হাভৃত্যা মন্ত্রিণো বিপ্রাঃ ক্ব তদ্রাজ্যং বিধেগতং।
হা শৈব্যে পুত্র হা বাল মাং ত্যক্ত্বা মন্দভাগ্যকং।
বিশ্বামিত্রস্য রোষেণ গতাঃ কুত্রাপিতে মম। *

ধূম পটলে চারিদিক আচ্ছন্ন। পিশাচ, ভূত, বেতাল, ডাকিনী, ও যক্ষে চারিদিক পরিপূর্ণ। শকুনি ও শৃগালে পরিব্যাপ্ত। চারিদিক কুক্কুরগণে বেষ্টিত। মাংস, বসা, মেদ, রক্ত জ্বলিতেছে। বাতাসে সেই গন্ধ চারিদিকে বহিতেছে। শোকার্ত্ত ব্যক্তির আর্ত্তনাদে চারিদিক পূর্ণ। 'হা পুত্র! হা মিত্র! হা বন্ধো! হা ভ্রাতঃ! হা বৎসে! হা প্রিয়ে! হা মাতঃ! হা ভাগিনেয়গণ! হা মাতুল! হা পিতামহ! হা মাতামহ! হা পিতঃ! হা পৌত্র! হা নাথ! আজ কোথায় গেলে? এরূপ আর্ত্তনাদ চতুর্দ্দিকে শুনা যাইতেছে। চিতার আগুনে অর্দ্ধদগ্ধ শবের পীতবর্ণ দন্ত নিচয় দেখা যাইতেছে। তাহাতে বোধ হইতেছে—তাহারা "দেহের ত এই দশা" বলিয়া হাস্য করিতেছে। আগুনের চট চট শব্দ, অস্থি রাশি মধ্যে পক্ষীগণের নাদ, চণ্ডালদিগের হর্ষবর্দ্ধক বান্ধবদিগের আর্ত্তনাদ। ভূত, বেতাল, পিশাচ ও রাক্ষসদিগের গীতধ্বনি ইত্যাদি ভীষণ শব্দ চারিদিকে শুনা যাইতেছে।

* হা ভৃত্যগণ! হা মন্ত্রীগণ! হা বিপ্রকুল! হা বিধাতঃ! আমার রাজ্য কোথায় গেল? হা শৈব্যে! হা শিশু সন্তান! হতভাগ্য আমাকে ত্যাগ করিয়া, বিশ্বামিত্রের কোপে তোমরা কোথায় গেলে?

এ। স্থানেই কৃশা, বিবর্ণা, বিমনা, ধূলি-ধূসরিতকেশা হরিশ্চন্দ্র-মহিষী শৈব্যা এক মাত্র প্রাণাধিক শিশু সন্তান রোহিতাশ্বের সর্পদষ্ট মৃতদেহ বক্ষে করিয়া, ভীষণ তামসী নিশাকালে "হা বৎস! হা পুত্র!" বলিয়া রোদন করিতে করিতে, সৎকারার্থে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ স্থানেই বিভিন্ন মূর্ত্তিধারী স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিয়াছিলেন না। এ স্থানেই রাজমহিষীর বিলাপ রোদনে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রোহিতাশ্বের মৃতদেহ চিনিতে পারিয়া

হা বৎস সুকুমারং তে স্বক্ষিভ্রূ নাশিকালকম্।
পশ্যতোমে মুখং দীনং হৃদয়ং কিং নদীর্য্যতে ॥
তাত তাতেতি মধুরং ব্রুবাণং স্বয়মাগতম্।
উপগুহ্য বদিষ্যে কং বৎস বৎসেতি সৌহৃদাৎ॥
কস্য জানু প্রণীতেন পিঙ্গেন ক্ষিতিরেণুনা।
মমোত্তরীয় মুৎসঙ্গ স্তথাঙ্গং মলমেষ্যতি ॥
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্ভূতো মনো হৃদয় নন্দনঃ।
ময়া কুপিত্রা হা বৎস বিক্রীতো যেন বস্তুবৎ।*

ইত্যাদি বলিয়া, বালকের মৃত দেহের নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

---

* হা বৎস! তোমার সুন্দর জনাসিকাও কেশযুক্ত কাতর মুখখানা দেখিয়া আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ হইতেছে না? অমৃতময় 'বাবা বাবা' বাক্য

এই স্থানেই দেবরাজ ইন্দ্র রাজা ও রাজ মহিষীর অতল দুঃখে গলিয়া, রোহিতাশ্বের প্রাণদান করিয়াছিলেন। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে এস্থানে বসিয়াই কবি তুলসী দাস——

রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ জই।
আপ্‌না মন্‌কো বশ করে যো, সব্‌কা শেরা ওই

প্রভৃতি উল্লেখে ও মধুর রামায়ণ পদাবলীতে উত্তর পশ্চিম ভারত মাতাইয়া ছিলেন। কিন্তু আজি তাহার কি রহিয়াছে? শুধু শ্মাশান! সমগ্র ভারতই আজি শ্মশান সাজিয়া। মণিকর্ণিকা ঘাটও আজি শ্মশান সাজিয়া, কেবল কাশীর মৃত দেহ গুলি উদরসাৎ করিতেছে।

২৭শে জুলাই (১২ই শ্রাবণ)—আমরা জয়পুরাধিপতি মহারাজা জয় সিংহ প্রতিষ্ঠিত "মাণ মন্দির" দেখিতে গেলাম। ইহা মহারাজা মানসিংহের স্মরণার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মাণ মন্দিরে প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক জ্যোতিষ যন্ত্র আছে। অনেকে বলেন মানসিংহের নামানুসারেই উহার নাম

বলিতে বলিতে সম্মুখে উপস্থিত আমি আর কাহাকে "বাছা বাছা" বলিয়া, আলিঙ্গন করিব? কাহার পদলগ্ন পিঙ্গল ধূলিতে আমার উত্তরীয় বস্ত্র, ক্রোড় ও অঙ্গ মলিন হইবে? হা বৎস! তুমি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইলে ও এই কুপিতা তোমাকে সামান্য বস্তুর ন্যায় বিক্রয় করিয়াছে।

মাণ্ মন্দির হইয়াছে। আমাদের বোধহয় 'মা' ধাতু হইতেই উহার নাম মাণ মন্দির হইয়াছে। তথাকার একজন লোক বলিল, একটী প্রস্তর নির্ম্মিত যন্ত্র হইতে দূরবীণ যোগে আকাশের দিকে চাহিলে, ধ্রুব নক্ষত্র পরিলক্ষিত হয়। সেখানে কোন জ্যোতির্ব্বিদ না থাকাতে, যন্ত্র সকলের প্রকৃত ব্যবহার কেহই আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারিল না।

২৮শে জুলাই (১৫ই শ্রাবণ) আমরা তিল ভাণ্ডেশ্বর দেখিতে যাত্রা করিলাম। তিল ভাণ্ডেশ্বর সম্বন্ধে কাশীতে এরূপ কিম্বদন্তি আছে, তিল ভাণ্ডেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার মোহিনী নাম্নী এক পরম সুন্দরী শুঁড়ী পত্নীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে যুবক যুবতীর প্রেম নিতান্ত গাঢ় হইয়াই দাঁড়াইল। এক দিবস শুঁড়ী মহাশয় মদক্রয় করিতে অন্যত্র গমন করিলেন। এই সুযোগে তিল ভাণ্ডেশ্বর ঠাকুর ও প্রণয়িনীর গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। যুবক যুবতী প্রেমোন্মত্ততায় আত্ম বিস্মৃত হইয়া আছেন, সমাজ শাসন যে, তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, তাহা কাহারো জ্ঞান নাই। সর্ব্বনাশ! স্বামী আসিয়া এমন সময় দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিজলীর পর অন্ধকারের ন্যায় মোহিণীর ফুল্লমূর্ত্তি শুষ্ক ভাবাপন্ন! এখন কি করিবে! কালাচাঁদকে কোথায় লুকাইবে? মোহিনী উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিল ভাণ্ডেশ্বরকে একটী শূন্য গর্ভ মদের জালার মধ্যে পুরিয়া রাখিল। শুঁড়ী মহাশয় বাজার হইতে অনেক মদ লইয়া

আসিয়াছেন। স্ত্রী নিদ্রোত্থিতের ন্যায় দরজা খুলিয়া দিলে পর, তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই জালাতে মদ ঢালিতে লাগিলেন। যে জালার মধ্যে শর্ম্মা লুকাইয়া, ক্রমে তাহাতেও মদ ঢালিতে লাগিলেন। তিল ভাণ্ডেশ্বর চুপ করিয়া, জালাতে বসিয়া আছেন। আর তাঁহাকে ডুবাইয়া মদ জালার পড়িতেছে। শুঁড়ী টের পাইলে তাহার মৃত্যু স্থির ও নিশ্চয়। জালাটী মদে পূর্ণ হইলেও তাঁহাকে ডুবিয়া মরিতে হইবে। এখন কোন্‌টী অবলম্বনীয়? অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া, শুঁড়ীর হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা এক 'মকারের" প্রেমে অন্য 'মকারে" মৃত্যুই অবলম্বনীয় বিবেচনা করিলেন, ও তন্মধ্যে চুপকরিয়া বসিয়া রহিলেন। শুঁড়ী মহাশয় ও মদের উপর মদ ঢালিয়া, জালাটী পূর্ণ করিয়া রাখিলেন। এখন ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যথেষ্ট মদ নাশিকা পথে শর্ম্মার উদরসাৎ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি মধু ভাণ্ডে মৃত মক্ষিকার ন্যায়, মদ ভাণ্ডে মত মানুষ সাজিয়া, স্ফীতোদর হইয়া রহিলেন! তাঁহার এই অমানুষী আত্মোৎসর্গের জন্যই তিল ভাণ্ডেশ্বর প্রস্তর-রূপী হইয়া, তিল দলে আজি হিন্দু দিগের পূজ্য। তথাকার লোক আমাদিগকে বলিল, উহা নাকি প্রতি দিন তিল তিল করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু আমরা কতক্ষণ দাড়াইয়া পরীক্ষা করিলাম, তাহাকে এক তিল ও বৃদ্ধি হইতে দেখিলাম

*সাড়নাথ বর্ত্তমান বেনারসের প্রায় ৪ মাইল উত্তরে অব-

স্থিত। ইহার অন্য নাম বুদ্ধ কাশী। বৌদ্ধ রাজা দিগের সময় ইহা ষাড়ঙ্গনাথ নামে অভিহিত হইত। হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ও নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া, এখন ষাড়নাথ হইয়াছে। ষাড়নাথের নিকটে এখনও ষাড়ঙ্গতাল নামে একটী জলাশয় দৃষ্ট হয়। মগধের গুপ্ত রাজাদিগের সময় প্রাচীন কাশীর শোভা সৌন্দর্য্য হীন তেজ হইয়া, ঐই ষাড়নাথই বুদ্ধ কাশী রূপে শোভা সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল তাহার সাক্ষী স্বরূপ আজিও কতগুলি বৌদ্ধ স্তুপ ও বৌদ্ধ মন্দির ভগ্ন কলেবরে দাড়াইয়া, সেই অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। স্তুপ গুলির মধ্যে "ধমকই" সর্ব্ব প্রধান। ধমকের সংস্কৃত নাম "ধর্ম্ম উপদেশক", পূর্ব্বে এই স্তুপের শিরোদেশে বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; এখন আর তাহা নাই, মুসলমান অত্যাচারে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ধমকের নিকটে আর একটী বৌদ্ধ স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। কাশীশ্বর চৈৎসিংহের দেওয়ান একটী নূতন বাজার নির্ম্মাণার্থে তাহা ভঙ্গ করিয়া, তন্মধ্যে দুইটী প্রস্তর পাত্র প্রাপ্ত হন। তাহার একটীর মধ্যে কতগুলি নরঅস্থি, মুক্তা, স্বর্ণ পাত ও নিম্ন লিখিত বিবরণ সহ একটী বুদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল।

"গৌড়েশ্বর রাজা মহীপাল শ্রীধর্ম্মর্ষির (বুদ্ধদেব) পাদপদ্ম পূজা করিয়া, কাশীতে ১০০ ঈশান ও চিত্র ঘণ্টা নির্ম্মাণ করেন। শ্রী স্থির পাল ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্ত পাল বৌদ্ধ ধর্ম্মের

পুনরুদ্ধার করিয়া, এই স্তুপ (Tower) নির্ম্মাণ করেন, সম্বৎ ১০৮৩ (খৃঃ ১০২৬)।"

ষাড়নাথে চৌকুন্দী নামে আর একটী বৌদ্ধ স্তুম্ভ ছিল। হুমায়ুন উহার উপরিভাগ ভঙ্গ ও নিজ নামে নামাঙ্কিত করিয়া, উহাকে "তোবা" পড়াইয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইয়াছিলেন।

কাশীতে এক সময় ধর্ম্ম বিপ্লবের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্ম হীনতেজ হইয় আসিল। সেই সময় বৌদ্ধমন্দিরে বৌদ্ধ স্তুপে, ষাড়নাথ পরিশোভিতছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন ও হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের বৌদ্ধ রাজা দিগকে পরাস্ত করিয়া, কনোজের রাজগণ ষাড়নাথ অধিকার করিয়া লইলেন। তাঁহারা ও বৌদ্ধ মন্দির ও স্তুপ সকল অন্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া, তাহাতে অধিবিশ্বেশ্বর, কীর্ত্তি বিশ্বেশ্বর, বাকর্ষ্য কুণ্ড প্রভৃতি দেবালয় নির্ম্মাণ করিলেন। পরিবর্ত্তন শীল প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন চলিয়াই উহার ক্রিয়া। দৃষদ্বতী তীর মুসলমান সমরে পৃথ্বী রাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত স্বাধীনতারবি চির অস্তগমন করিলে পর, মুসলমানগণ আবার হিন্দুধর্ম্ম সংহারে মনোযোগী হইলেন। পাঠান বিশেষতঃ মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে সে সমস্ত মন্দির আবার ভগ্ন হইয়া আরঙ্গজিবমসজিদ,কাঙ্গুরামসজিদ আলমগিরি মসজিদ,চৌখাম্বা মসজিদ,হুমায়ুনস্তম্ভ ইত্যাদি রূপেপরিণতহইল।

আমরা বেনারসে কয়েক দিন থাকিয়া, যত পারিলাম উহা পরিদর্শন করিতে ক্রটী করিলাম না। যেখানে বেনারসী শাড়ী প্রস্তুত হয়, তাহাও একদিন আগ্রহের সহিত দেখিয়া আসিলাম। দেখিয়া বিদেশীয় শিল্পদ্রব্যের প্রাদুর্ভাবে যে, দেশীয় শিল্প দিন দিন লোপ পাইতেছে, তাহা ভাবিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলাম। কাশীতে এ অল্প কয় দিনের অবস্থানেই আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, বর্ত্তমান সময়ে কাশী আর সেরূপ পুণ্য ক্ষেত্র নয়। নানা প্রকার পাপাচারী আসিয়া, কাশীতে আশ্রয় লইয়া, উহা এক প্রকার পাপ ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে। কাশীর রাস্তা ঘাটগুলি বড় কদর্য্য, কিন্তু বড় রাস্তাগুলি মন্দ নয়। সংকীর্ণ গলিতে ষাঁড় গুলির গতি বিধি দেখিয়া, নবাগত ব্যক্তিরা নিতান্ত ভীত হইয়াই পড়েন। লোকে বলে, কাশীতে ষাড়ের ও রাঁড়েরই অতিশয় প্রাদুর্ভাব।" স্বাভাবিক ষাড় ভিন্ন কাশীতে আর এক জাতীয় অস্বাভাবিক ষাড় আছে, উহাদিগকে সচরাচর কাশীর "গুণ্ডা" বলে। সময় সময় গুণ্ডারা কাশীতে কিরূপ উপদ্রব করিয়া থাকে, কাশীবাসী সকলেই তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। হিন্দুর এত পবিত্র পুণ্য ক্ষেত্রেও পাদরী মহাশয়েরা একটী গির্জ্জা সংস্থাপন করিতে ক্রটী করেন নাই। প্রাচীন কাশীতেও মুসলমান মস্‌জিদের অভাব নাই। পূর্ব্বে যাহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির ছিল, তাহা এখন মুসলমানের মসজিদ। আমরা ভারতের অনেক স্থানেই হিন্দু দেব দেবীর

প্রভৃতি, মুসলমান অত্যাচারের এরূপ যথেষ্ট চিহ্ন দর্শন করিয়াছি। কাশীতে আমাদের আত্মীয় স্বজন অনেক, পাছে এখানে কেহ আমাদের পলায়ন বৃত্তান্ত জানিয়া, আমাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দেন, সেই ভয়ে শীঘ্রই কাশী ত্যাগ করিয়া, আমরা অযোধ্যা অভিমুখে রওনা হইলাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

অযোধ্যা—ফয়জাবাদ।

৩০শে জুলাই (১৬ই শ্রাবণ)—আমরা বেণারস ত্যাগ করিয়া আউড্ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে (Oude and Rohilkhand Ry,) অযোধ্যা যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই আমরা ষ্টেষণে আসিয়াছি। গাড়ী আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব। আমরা সিক্রোল ষ্টেষণের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, দ্রষ্টব্য স্থান গুলি দেখিতে লাগিলাম। ষ্টেষণটী দেখিতে সুন্দর, বেশ পরিষ্কৃত স্থানে অবস্থিত। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা গাড়ী চাপিয়া, অযোধ্যা রওনা

হইলাম। রেল পথের দুধারে শাল গাছগুলি সারি সারি দাঁড়াইয়া, গাছের পর ধুধু মাঠ, নিকটে কাকপ্রাণীরও বসতি আছে বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গদেশ হইতে এ সমস্ত স্থানের প্রকৃতি যে ভিন্ন প্রকৃতির, গাড়ীতে বসিয়াই আমরা তাহা বেশ অনুভব করিতে পারিলাম। রাস্তায় জৌনপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া, রাত্রি ১২ টার পর আমরা অযোধ্যা ষ্টেষণে আসিয়া পৌঁছিলাম। অযোধ্যা একটি ক্ষুদ্রকায় ষ্টেষণ, রামের বাড়ী এ স্থান হইতে প্রায় ৪ মাইলেরও অধিক। ঘোর বিদেশে রাত্রি কালে কোথায় যাইয়া মারা যাইব, ষ্টেষণেই রাত্রিটী কাটাইব বলিয়া স্থির করিলাম। সে সমস্ত স্থানে সরাইই যাত্রীদের প্রধান আশ্রয় স্থল। আমরা রাত্রি কাটাইবার জন্য একটী সরাই আশ্রয় করিলাম। সরাইর নিকটে একখানা হালুই দোকান। হালুই মহাশয় এত রাত্রি জাগিয়াও যাত্রীদের জন্য লুচি ভাজিতেছেন। তাহার পরিধানে ঘৃত মাখা ওয়ফে ঘিয়েভাজা কৃষ্ণ বস্ত্র,সমস্ত শরীরে ময়লা পড়িয়া, আগুণে তাতিয়া, বেশ রং চড়িয়াছে। তাহার শরীর খালি, কিন্তু মাথায় সর্ব্বদা একখানা কাপড় জড়ান আছে। এ সমস্ত দেশে নেড়া (খালি) শিরে থাকা বড় অসম্মানের চিহ্ন। লুচি ভাজার ফশ্ ফশ্ শব্দ হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সে দেশী যাত্রীদেরও মন ফশ্ ফশ্ করিতেছিল। কিন্তু লুচীর উপর আমাদের আর রুচি নাই। অন্য কিছু ও খাইবার পাওয়া যায় না, বাধ্য হইয়াই আমরা

কতকগুলি লুচি তরকারির সংকার করিয়া, সেই রাত্রির জন্ত একখানা খাঁট্‌লি ভাড়া করিয়া, তাহাতে শয়ন করিলাম। ঘোর বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছি; স্বদেশীর মধ্যে আমি নিজে আর ভায়া, রাত্রিতে ভয়ে ভয়ে নিদ্রা হইল না। আর এক অসুবিধা, আমাদের খাট্‌লি গুলি বড় খাট্‌মলে (ছার পোকায়) ভরা ছিল। তাহাদের অনুগ্রহে সমস্ত রাত্রিই আমাদিগকে জাগিয়া কাটাইতে হইল।

পর দিন ৩১ শে জুলাই (১৭ই শ্রাবণ) আমরা খুব প্রত্যুষে ঘরের ভাড়া দিয়া, খাটলির ভাড়া দিয়া, অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঘর হইতে বাহির হওয়া মাত্রই একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া, বেণারসের গঙ্গা পুত্রের ন্যায়, আমাদের পেছনে লাগিল। "আমরা খুব পুণ্যবান, আমাদের ভাগ্য কত প্রশস্ত যে, এরূপ মহাতীর্থ দর্শনে সক্ষম হইয়াছি" প্রভৃতি কত কথা উল্লেখে পণ্ডিতজী আমাদিগকে পটাইতে চেষ্টা করিলেন। আমরাও "আমরা নেহাত পাপী, আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্য জগত সংসারে নাই" প্রভৃতি উল্লেখে ঠাকুরজীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলাম। ঠাকুরজী কিছুতেই আমাদের পশ্চাৎ ছাড়িতেছেন না; তাঁহার সহিত বাকবিতণ্ডা করিতে করিতে আমরা অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাস্তায় কাহারো বাড়ী ঘর প্রায়ই দেখিলাম না। মাঝে মাঝে দুই একটা আম বাগান দেখিয়া, পেটুকের প্রাণ কিন্তু বড়

নাচিয়াছিল। তখন শ্রাবণ মাস। তবু অনেক গাছে পাকা, কাঁচা আঁব দেখিয়া, আমাদের রসনা-দেব একটুকু ব্যাদবী করিতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক আমরা যতই অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম; ততই দু একখানা করিয়া কুঁড়িয়া দেখিতে পাইলাম। তাহার পর আসিয়া দেখি, রাস্তার মাঝে, এ পাশে, ও পাশে, ঘরের উপর, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বানর বসিয়া আছে। সে সমস্ত রামানুচরবর্গকে দেখিতে পাইয়া, আমরা অযোধ্যা পৌঁছিলাম বলিয়া স্থির করিলাম। অযোধ্যাতে নরের সংখ্যা অপেক্ষা বানরের সংখ্যা শত গুণ অধিক। তাহাদের উৎপাতে কাহারও স্থির থাকিবার যো নাই। মুদী, পশারি, গৃহস্থ সকলেই উহাদের অত্যাচারে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত; অথচ উহাদিগকে ভুলেও কেহ কট কথাটী কহিবে না। শ্রীরামজীর রাজত্ব কালে তাহারা যে ম্যাগ্নাকার্টা (Magnacharta.) স্বাক্ষর করিয়া লইয়াছে, তাহার বলেই উহারা আজিও পশ্চিম ভারতে হিন্দুজাতির প্রতি এরূপ একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম একজন যাত্রী একখানা কাপড়ে কয়েকটী আমরুদ (পেয়ারা) বাঁধিয়া রাখিয়া, পাঁচ ছয় হাত দূরে একখানা মুদি ঘরে খাবার খরিদ করিতে ছিল, ইত্যবসরে এক বানর ভায়া নামিয়া আসিয়া, তাহার কয়েকটী পেয়ারা লইয়া, একটী ঘরের উপর উঠিয়া ভোজনে নিযুক্ত হইল। গরীব বেচারা আর কি করে! সে ক্যাল ক্যাল

দৃষ্টিতে প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। রাস্তায় বানর মহাশয়দিগের এত বাড়া বাড়ি দেখিয়া, আমাদের বড় ভয় হইয়াছিল। সে সময় ভয়ে ভয়ে শ্রীহট্টের একটা গল্প আসিয়া মনে পড়িল। আমাদের পাঠকদিগকে আমরা সে গল্পটা না শুনাইয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা শ্রীহট্টের একজন গ্রাম্য লোক এক অরণ্যের মধ্য দিয়া, গ্রামান্তরে যাইতেছিল। হঠাৎ এক প্রকাণ্ড বানরের সহিত তাহার সাক্ষাত। বানরকে দেখিয়া নর মহাশয়ও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, একেবারে চেঁচাইয়া উঠিলেন "এ মর্কট্ট খুবাই যাইতৈন্" (হে মর্কট কোথায় যাস্)। মর্কটও ইহা শুনিয়া, ক্ষণ বিলম্ব না করিয়াই, গ্রাম্য ভায়াকে আক্রমণ করিল। বেচারা এখন কি করে? একেবারে নিরুপায় ভাবিয়া, গলবস্ত্রে বলিতে লাগিল "আপ্নি খাম্ড়াইবেন্ না, এচৈড়বেন্ না, আপ্নি স্বয়ং বগ্মান চন্দ্র; কে খৈছে আপনারে মর্কট্ট" (অর্থাৎ আপনি কামড়াবেন না, আঁচড়াবেন না, আপনি স্বয়ং ভগ-বান চন্দ্র, আপনাকে মর্কট বলে কে?) আমরাও তখন মনে মনে স্থির করিলাম যে বানর মহাশয়েরা আমাদিগকে অনুগ্রহ করিলে, আমরাও একেবারে তাহাদের পদতলে পড়িয়া, বলিব "আপনারা আমাদিগকে কামড়াবেন না, আপনারা স্বয়ং ভগবান চন্দ্র, আপনাদিগকে মর্কট বলে কে?" যাহা হউক তাঁহারা আমাদিগের প্রতি বিশেষ

অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু তাহাদিগকে চারিদিকে ঘুরিতে ফিরিতে দেখিয়া, আমরা বড় ভয়ে ভয়ে সরযু-তীরে যাত্রা করিলাম।

অযোধ্যা একখানা ছোট খাট বন্দর। কিন্তু রামায়ণে এই অযোধ্যাই খুব বিস্তৃত স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভগবান মনু স্বয়ং ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এক সময়ে এই মহাপুরীমর্ত্ত্যে অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। রামায়ণে লিখিত আছে——

কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্ট সরযুতীরে প্রভূত ধন ধান্যবান॥
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীৎ লোক বিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেন সা পুরা নির্ম্মিতা স্বয়ং॥
আয়তা দশচ দ্বেচ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্ত মহাপথা।*

আমরা বন্দর অতিক্রম করিয়া, সরযুতীরে আসিলাম। অযোধ্যার উত্তর বাহিয়া সরযু (ঘর্ঘরা) পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব-

---

* সরযুতীরে কোশল নামে প্রভূত ধনধান্যশালী সুবিস্তীর্ণ মহা জনপদ আছে। সেই জনপদেই অযোধ্যা নামে প্রসিদ্ধ নগরী। মানবেন্দ্র মনু কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই সুবিভক্ত মহাপথা শ্রীমতী মহাপুরী দৈর্ঘ্যে ১২ যোজন ও প্রশস্তে ৩ যোজন।

দিকে চলিয়া গিয়াছে। বর্ষার সোহাগ পাইয়া, সরযু পূর্ণ যৌবনে ভরা পূরা। বর্ষার অপরিষ্কার জলে রাশি রাশি কচ্ছপ ভাসিয়া আছে। গত রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নাই বলিয়া, আমরা স্নানের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিলাম। স্নান করিবার জন্যই আমরা সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত হইলাম। ঠাকুরজী সে পর্য্যন্ত ও আমাদের সঙ্গত্যাগ করেন নাই। আমাদিগের স্নানের উদ্যোগ দেখিয়া, ঠাকুরজী কুশা, তুলসী প্রভৃতি লইয়া, আমাদিগকে তর্পণের মন্ত্র পড়াইবার জন্য উপস্থিত। আমরা কোন মতেই তর্পণের মন্ত্র পড়িব না, তিনিও আমাদিগকে মন্ত্র পড়াইবেনই পড়াইবেন। আবার একটা রাম রাবণের যুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। উপায়ান্তর না দেখিয়া, আমরা বলিলাম "আমরা ইশাই (খ্রীষ্টান)।" এতক্ষণ পরে ঠাকুরের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইলাম। স্নানের সময় কচ্ছপের ভয়ে বড় ভীত হইয়াছিলাম। ভয়ে ভয়ে স্নান করিয়া উঠিয়াই কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। ঘুমে চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে, অথচ নিকটে কোন সরাই নাই যে, সেখানে যাইয়া বিশ্রাম করিব। অবশেষে কোন নির্জ্জন স্থানে গাছ তলায় যাইয়া, নিদ্রা যাওয়াই স্থির করিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা এক নির্জ্জন স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। তাহার নাম সুগ্রীবের বাড়ী। উহার চতুর্দ্দিক ও মধ্যস্থান তেতুল ও নিমগাছে পরিপূর্ণ; তথাপি স্থানটী বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। রঘুকুল তিলক শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেদ যজ্ঞ সমাপন কালে বানরেশ্বর সুগ্রীবকে এস্থানে বাসস্থান প্রদান করিয়া

ছিলেন। আমরা একটী তেতুল গাছের নীচে কাপড় পাতিয়া, ভায়াতে আমাতে শয়ন করিলাম। গাছের শীতল ছায়ায় অল্পেই আমাদের চক্ষু বুজিয়া আসিল। আমরা সুখে নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময় এক "ভগবান চন্দ্র" (বানর) আসিয়া, আমার গায়ের কাপড় খানা ধরিয়া জোরে এক টান মারিল। জাগিয়া দেখি, প্রভু এক গাছের ডালে উঠিয়া, আমাদিগকে মুখভঙ্গী দেখাইতেছেন। তখনই ভায়াকে জাগাইয়া বলিলাম "এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই, এ বানর বেটারা মানুষ নয়, ইহারা নিতান্ত অসভ্য।" অবশেষে সুগ্রীবের বাড়ী সুগ্রীব সহচরদিগকেই একচেটিয়া ভোগ করিতে ছাড়িয়া দিয়া, আমরা অযোধ্যার অন্যান্য স্থান সকল পরিদর্শন করিলাম।

অযোধ্যায় দেখিবার এখন বিশেষ কিছু নাই। যে কতগুলি দেব মন্দির আছে, তাহাও আধুনিক বলিয়া বোধ হইল। দেব মন্দিরের মধ্যে "হনুমান গড়" (অন্য নাম মহাবীর গড়) ই সর্ব্ব প্রধান। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের প্রধান ভক্ত বলিয়া, হনুমানজী কলিতে অযোধ্যার প্রধান আরাধ্য দেবতা। এমন কি, যাহারা হনুমান মন্ত্রে দীক্ষিত, তাহারা উপাসনা কালে হনুমানের ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়িয়া, মুখভঙ্গী করিয়া, ধর্ম্ম কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। হনুমান গড়ের পরই জন্মস্থান প্রধান দেব মন্দির। এস্থানে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত মন্দির আছে, তাহা তত প্রসিদ্ধ নয়। সরযূতীরে কোন স্থান "রাম ঘাট" কোন স্থান "সীতা ঘাট" কোন

স্থান "লছমণ ঘাট" নামে বিখ্যাত। এই "লছমণ ঘাটেই" ভ্রাতৃভক্ত লক্ষণ ভ্রাতৃ আজ্ঞা পালনার্থে, সরযু জলে আত্ম নিক্ষেপ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। "রাম ঘাটে" ভ্রাতৃবৎসল রামও সেই জীবনসর্ব্বস্ব ভ্রাতার পথ অবলম্বন করিয়া জীবনে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা প্রত্নতত্ত্ববিৎ (Antiquarian) নহি, নতুবা সীতার এক গাছা ভাঙ্গা চুড়ি অথবা লক্ষণের কোন একখানা তাম্র ফলক বাহির করিয়া, তাহাদের জাতি, সময়, কুষ্টি ঠিকতি ইত্যাদি নির্ণয়ে প্রত্নতত্ত্ববিৎ হইয়া, দু একটা অক্ষরোপাধি গ্রহণে প্রেত ভাবাপন্ন হওয়ার পরও, নামটা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সময় আমাদের সঙ্গে দু এক খানা নাটক নভেল ভিন্ন আর কোন ইংরেজী গ্রন্থ ছিল না বলিয়াই, আমরাও কোন উপাধি লাভেব্যাধিগ্রস্থ হইতে পারিলাম না। নতুবা কয়খানা ইতিহাস সঙ্গে থাকিলেই, এক বার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম "অদৃষ্ট ফিরে কিনা।

এরূপে কতক্ষণ পরিদর্শন করিয়া, আমরা এক দেব মন্দিরের নিকট আর এক বট গাছের নীচে আসিয়া আবার আশ্রয় লইলাম। তখনও যথেষ্ট বেলা আছে। একটুকু রৌদ্র পড়িলেই আমরা ফয়জাবাদ রওনা হইব। কতক্ষণ পরেই দেখি, দু একটী করিয়া লোক বটতলায় উপস্থিত হইতেছে। তাহারা একটী স্থান খুড়িয়া, আমাদিগকে নানা প্রকার "কছুরৎ" দেখাইতে লাগিল। আমরা 'কলকাত্তাকা বাবু সাহেব'

নানা প্রকার প্রশংসা বাক্যে, তাহাদিগকেও নিতান্ত কৃতার্থ করিয়া ফেলিলাম। এক পাণ্ডা ঠাকুর ছিলেন, তিনি কেন প্রশংসার ভাগটা ছাড়িবেন? তিনি তাঁহার মন্দিরে যাইয়া, আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ মিষ্টি লইয়া আসিলেন। ভাল খাবার পাইয়া, ঠাকুরের প্রতি খুব ভক্তি হইল; আমরা কত ভক্তিতে ঠাকুরের প্রসাদ উদরসাৎ করিয়া ফেলিলাম। পাণ্ডা ঠাকুর তাঁহার জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিতে, আমাদের নিকট বসিয়া, অযোধ্যার পৌরাণিক, আধুনিক অনেক ইতিহাস, ভূগোল বলিতে আরম্ভ করিলেন। রামায়ণ, মহাভারত আমাদের কণ্ঠস্থ জানিয়া, তিনি একবারে অবাক! তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন "বাবু লোক বহুত লেখনে পড়নেওয়ালা হ্যায়।" তিনি আর তাঁহার ইতিহাস, ভূগোলের পুঁজি আমাদের কাছে বাহির করিলেন না। বাস্তবিক এই সমস্ত স্থানে শিক্ষার এত অভাব যে, যে রামায়ণ মহাভারত একটুকু পড়িতে পারে, সেই নিতান্ত জ্ঞানী, নিতান্ত পণ্ডিত। বাল্মীকির দেশ এখন এরূপ অজ্ঞমূর্খে পরিপূর্ণ!!!

আমরা অযোধ্যা দর্শন করিয়া, শেষবেলা ফয়জাবাদ রওনা হইলাম। প্রায় ৫।৬ মাইল রাস্তা হাটিয়া, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসিয়া ফয়জাবাদ পৌঁছিলাম। ফয়জাবাদ অযোধ্যার নবাব বংশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, মসজিদ ও অন্যান্য মনোহর অট্টালিকায় ফয়জাবাদ পরিপূর্ণ। ফয়জাবাদে

একটী ব্রিটিশ সেনা নিবাস (Cantonment) আছে। এই ফয়জাবাদেই সুজাউদ্দৌল্লা-তনয় নবাব আসফ উদ্দৌল্লার প্রবঞ্চনায়, অর্থলোভী হেষ্টিংস সুজাউদ্দৌল্লার বিধবা বেগম ও মাতার ভৃত্যদ্বয়কে নির্দ্দয় উৎপীড়ন করিয়া, নিরাশ্রয়া বেগম দ্বয়ের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণে, ব্রিটননামে কলঙ্ক লেপন করিয়া ছিলেন। হেষ্টিংসের এই ফয়জাবাদ কাণ্ডের মর্ম্মো-দ্ঘাটন করিবার জন্যই মহাত্মা এড্‌মণ্ড বার্ক স্বীয় ওজস্বী বক্তৃতা বলে পার্লিয়ামেণ্ট সভা গৃহ মাতাইয়া, আবার ব্রিটন নামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

আমরা ফয়জাবাদে অধিক সময় অবস্থান করি নাই বলিয়া, ফয়জাবাদ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাঠকবর্গকে জানাইতে পারিলাম না। ইহা আমাদের ও পাঠক বর্গের উভয়েরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

রাত্রি একটার পর বেণারসের গাড়ী আসিয়া ফয়জাবাদ পৌঁছিবে। আমরা সেই গাড়ীতে লক্ষ্ণৌ যাইব। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিলাম। গত দুই দিন ভাত খাই নাই। ভেতো বাঙ্গালীর প্রাণ ভাতের জন্য কিরূপ লালায়িত হইয়াছে, আমাদিগের পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ আমাদের সেরূপ অবস্থায় পড়িতেন, তবে তাহা কত-কটা অনুভব করিতে সক্ষম হইতেন। আমাদের রান্না করিবার কিছু নাই, অথচ ভাত না খাইয়া, প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। ভায়া লুচির দিকে একবার ঝুকিলেন; ক্ষুধার জ্বালায় ভায়াকে

কাণ মলিয়া দিতে ইচ্ছা হইল। অবশেষে নানা তর্ক বিতর্কের পর দেখি, এক 'মহারাজ' (সে দেশে ব্রাহ্মণকেই সচরাচর মহারাজ বলিয়া থাকে) মাথায় পটকা বাঁধিয়া, একটী লোটা লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আমাদিগকে চারিটী ভাত রাঁধিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। আমাদের ব্যগ্রতা দেখিয়া, মহারাজ বাহাদুর আমাদের নিকট রান্নার পরিশ্রমের বাবদই একবারে পাঁচ আনা চাহিয়া বসিলেন। অবশেষে তিন আনায় আমাদিগকে চারিটী ভাত রাঁধিয়া দিবেন বলিয়া, তাহার সহিত রফা করিলাম। আমরা চাল, আলু, গুঁইয়া (এক প্রকার ছোট কচু) ও গুইটে কিনিয়া দিলাম। মহারাজ চাল, আলু, গুঁইয়া সমুদয় ধুইয়া, লোটায় পুরিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে গুইটের আগুণ জ্বালিয়া দিলেন। আমরাও ভাতের আশায়, একটী কুয়ার নিকট তীর্থের কাকের মত হা করিয়া বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরেই শুনি ভাতের আওয়াজ্ হইতেছে, সে শব্দ যেন আমাদের কাণে অপ সরা সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন ক্ষুধার চোটে ভাবিয়া ছিলাম, এমন সুমধুর সুশ্রাব্য স্বর কোন সঙ্গীতে নাই, কোন বাদ্য যন্ত্রে নাই। ক্রমে মহারাজ ক্ষণেক বসিয়া, ক্ষণেক উপুর হইয়া, ক্ষণেক ধুয়ার চোটে চক্ষু বুজিয়া, ক্ষণেক বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া,আগুণে ফুৎকার করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর কতক ফুটা, কতক আফুটা, কতক শক্ত, কতক নরম, রুচি অনুসারে যাহার যেরূপ দরকার,

নানাবিধ পেটার্ণের (Pattern) ভাত নামাইয়া, শাল পাতায় ঢালিয়া দিলেন। ভাতের দিকে চাহিয়া দেখি কি সুন্দর! জগতে যেন ইহাপেক্ষা সুন্দর আর কিছু নাই। ভাতের মুখশ্রী ছিল না, আকর্ণ চক্ষু ছিল না, বিম্বোষ্ঠ ছিল না, তবু সে দিন, সে সময় ভাবিয়া ছিলাম "এ ভাতই জগত সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পদার্থ!" আমরা কিঞ্চিৎ ঘি ও কর্কর-লবণ যোগে ভাত খাইতে বসিলাম। সে দিন, সে সন্ধ্যা সময়ে, ফয়জাবাদের সে কুয়ার পাড়ে বসিয়া, সে ভাত কটী খাইয়া, যে সুখ ও যে তৃপ্তি বোধ করিয়া ছিলাম, জীবনে কখন কিছুতে এরূপ তৃপ্তি বোধ করিয়াছি কি না সন্দেহ।

আহারান্তে আমরা ষ্টেষণে আসিয়া, গাড়ীর অপেক্ষায় বিশ্রাম করিলাম। রাত্রি একটার পর বেণারসের গাড়ী আসিলে আমরা লক্ষ্ণৌ রওনা হইলাম।

পঞ্চম অধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ।

১লা আগষ্ট (১৮ই শ্রাবণ) সূর্য্যোদয় না হইতেই আমরা লক্ষ্ণৌ আসিয়া পৌঁছিলাম। বঙ্গদেশে থাকিয়াই লক্ষ্ণৌর কত কথা শুনিয়াছি, লক্ষ্ণৌ দেখিবার জন্য আমাদের হৃদয় কিরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গকে জানাইতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। অতি প্রত্যুষে লক্ষ্ণৌ ষ্টেষণে আমাদের গাড়ী পৌছিলে, তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিলাম। তখনও চারিদিক ভাল করিয়া পরিষ্কার হয় নাই। লক্ষ্ণৌর বহির্দৃশ্য যেন আমাদের চক্ষে বড় নূতন বোধ হইতে লাগিল। আমরা একটা কুলীর ঘাড়ে সমুদায় দ্রব্যজাত চাপাইয়া, সহর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথের দুধারে ছোট ছোট বাগান। সে সমস্তের দৃশ্য বড় সুন্দর, বড় মনোহর! সে সমস্ত বাগান অতিক্রম করিয়া, আমরা সহরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। সহরের দক্ষিণ প্রান্তে একটী সুগভীর খাল, পরিখা (Ditch) রূপে লক্ষ্ণৌর দক্ষিণ দিক বেষ্টন করিয়া আছে। এই পরিখার উপর একটী সেতু, আমরা তাহা পার হইয়া, লক্ষ্ণৌ সহরে প্রবেশ করিলাম। লক্ষ্ণৌতে বাঙ্গালী অনেক, রাস্তায় বাঙ্গালী

বাবুদের বিস্তর যাতায়াত দেখিয়া, এ স্থানটীও বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বলিয়াই যেন আমাদের নিকট বোধ হইতে লাগিল। এত বাঙ্গালী থাকিতে আমরা অন্যত্র থাকিব কেন? কোন বাঙ্গালী বাবুকে আতিথ্য গ্রহণে চরিতার্থ করিতেই আমাদের ইচ্ছা হইল। এখন প্রশ্ন লোকের নিকট কি বলিয়া অতিথি হইতে হয়? জীবনে কখনো অন্যের গলগ্রহ হই নাই, আজি এই নূতন ব্রতে ব্রতী হইতে কিছুতেই আমাদের প্রাণ সরিতেছে না। ভায়াতে আমাতে ইহা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম। অবশেষে স্থির করিলাম, অদৃষ্ট দোষে যখন এই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, তখন মাঝে মাঝে আমাদিগকে এ অভিমান টুকু ত্যাগ করিতে হইবেই হইবে। কুলী আমাদিগকে একখানা বাগান বাড়ীতে লইয়া গেল। উহা একটী ডিস্পেন্সরী, সম্মুখে ফুলের গাছে ভরা একটী ক্ষুদ্র বাগান। বাড়ীটী দেখিতে বড় সুন্দর। কুলীকে ভাড়া দিয়া, আমরা ডিস্পেন্সরীর বারেন্দায় একখানা টুলের উপর যাইয়া বসিলাম। সেখানে একটী লোকও নাই। আমরা যে বাড়ীর কর্ত্তাকে অনুগ্রহ করিতে আসিয়াছি, এ কথা এখন কাহাকে বলি? কতক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মাতৃহীন বালকের ন্যায় উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিতে লাগিলাম। সে সময় ভায়ার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া, আমার বড় হাসি পাইয়াছিল। যাহা হোক এ অবস্থায় আমাদিগকে অধিক-

ক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল না। বাড়ীর কর্ত্তাটী অন্দর বাড়ী হইতে বাহিরে আসিয়াই, আমাদিগকে দেখিতে পাইলেন আমরা ভ্রমণকারী, কলিকাতা হইতে আসিয়াছি জানিয়া তিনি আর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া একেবারে তাঁহার বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন, ভৃত্যাদিগকে আমাদের পরিচর্য্যার জন্য অনুমতি করিলেন বাবুটীর নাম শ্রীযুক্ত বাবু প——তিনি একজন এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন, লক্ষ্ণৌর মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক। বাস্তবিক তাঁহার অপরিমিত শিষ্টাচারে, যত্নে ও সদয় ব্যবহারে আমরা এরূপ আপ্যায়িত হইয়াছিলাম যে, তাহা আমরা জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না। প——বাবুর অতিথি রূপে আমরা এরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, বিদেশের কষ্ট একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমাদের জীবনে এই প্রথম আতিথ্য গ্রহণ। প্রথম আতিথ্য গ্রহণেই এরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিয়া, আমরা আমাদিগকে খুব ভাগ্যবান মনে করিলাম; আর প বাবুকে তাঁহার সদয় ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় আমরা লক্ষ্ণৌ সহর দর্শনে বাহির হইলাম। সর্ব্ব প্রথমে আমরা লক্ষ্ণৌ "চক্" দেখিতে যাত্রা করিলাম। সহরের পশ্চিম প্রান্তেই "চক্"। বাজারকে বোধ হয় মুসলমানী ভাষায় 'চক্' বলিয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ 'চক্'ও একটী বাজার ভিন্ন আর কিছু নয়। চকে আমরা

নাশ্‌পাতী' নামক এক প্রকার নূতন ফল আস্বাদন করিলাম, পরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। নাশপাতী নিতান্ত সুস্বাদু ফল। লক্ষ্ণৌতে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীও নিতান্ত সুলভ বলিয়া বোধ হইল। আমরা চক দেখিয়া লক্ষ্ণৌর "কেল্লা" (Fort) পরিদর্শন করিলাম। কেল্লাটী বাহির হইতে দেখিতে বড় সুন্দর, কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা অন্য যে সমস্ত দুর্গ দেখিয়াছি, লক্ষ্ণৌর কেল্লা তাহাপেক্ষা সবল বলিয়া বোধ হইল না। সহরের পশ্চিম প্রান্ত দেখিয়া, ফিরিয়া আসার কালীন আমরা একজন মৌলবীর সহিত সাক্ষাত করিলাম। মৌলবী সাহেবের বাড়ীতে পৌঁছা মাত্রই, তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া, আমাদিগকে দুহাতে সলাম বাজাইতে লাগিলেন, আর "আইয়ে জেনাব্ মেহেরবান" বলিয়া আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মৌলবী সাহেবের এরূপ আদব কায়দা (Politeness) দেখিয়া আমরা অবাক! তাঁহার সহিত অনেক আলাপের পর, আমরাও দুহাতে দাড়ি স্পর্শ করিয়া, পরস্পর সেলাম পরিবর্ত্তনান্তর সেস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। আদব কায়দা সম্বন্ধে তথাকার লোকদিগকে নিতান্ত ভদ্র বলিয়া বোধ হইল।

আদব কায়দা সম্বন্ধে লক্ষ্ণৌবাসীদের সম্বন্ধে এরূপ গল্প আছে যে, একদা সন্ধ্যার পর দুই জন মৌলবী বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়েই এক গভীর নর্দ্দামার পড়িয়া গেলেন।

নর্দ্দামা হইতে উভয়কেই গাত্রোত্থান করিতে হইবে। এ সময়ও তাঁহাদের আদব কায়দার ব্যারাম উপস্থিত। বড় ভদ্রতা প্রদর্শনে এসময়েও একজনে আর একজনকে বলিতেছেন "আপ্ আগাড়ি উঠিয়ে", অন্য জন বলিতেছেন "নেহি আপ্ আগাড়ি উঠিয়ে।" উভয়ে নর্দ্দামার ভিতর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, ময়লায় সমস্ত শরীর ডুবিয়া, তবু আদব কায়দা দেখাইতে পরস্পর কেবল "আপ্ আগাড়ি উঠিয়ে, আপ্ আগাড়ি উঠিয়ে" বলিয়া একজনের উপর অন্য জন চিৎ হইয়া পড়িয়া আছেন। পরে এক পাহারাওয়ালা আসিয়া, উভয়কে টানিয়া তুলিয়া নর্দ্দামা হইতে উদ্ধার করিল। একবার নাকি রেলগাড়ীতে জিনিস পত্র উঠাইয়া দিয়াও দুই জন মৌলবী "আপ আগাড়ি উঠিয়ে, আপ্ আগাড়ি উঠিয়ে" বলিয়া, এরূপ ভাবে আদব কায়দা দেখাইতেছিলেন। গাড়ীও ইত্যবসরে তাঁহাদের আদব কায়দার ধার না ধারিয়া, তাহাদিগকে ফেলিয়া, তাঁহাদের জিনিস পত্রসহ চলিয়া গেল। বাস্তবিকও লক্ষ্ণৌতে মুসলমানী আদব কায়দার বেশ প্রাদুর্ভাব। এমন কি সাধারণ মেছুনীগণ পর্য্যন্ত ক্রেতা-দিগের সহিত সুন্দর আদব কায়দায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে।

২রা আগষ্ট (১৯ এ শ্রাবণ) প্রাতে আমরা লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ 'কেইশোর বাগ্' নামক উদ্যান পরিদর্শন করিলাম। অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজেদ্ আলী সাহার সময়ে

অবস্থান কালীন এ উদ্যান ভারতের একটী মহৎদৃশ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। আজি বিদেশীর হাতে পড়িয়া, তাহার শোভা সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে। সুবিখ্যাত "চাঁদ্নী বারদোয়ারী" এখন হীন দশাপন্ন। কেইশোর বাগের ঠিক মধ্যস্থলে ক্যানিং কলেজ' ও পশ্চিম প্রান্তে সরকারি আফিস গুলি। যেস্থানে নবাবের জেনানা মহল ছিল, তাহা এখন মিলিটারি জেলখানা (Military Jail)। নবাব বেগমদিগের বিলাস ভূমি, এখন দুর্দ্দান্ত সেনা-কয়েদীর বাসস্থান। পরিবর্ত্তনশীল জগতে ইহাপেক্ষা আর অধিক কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে? আমরা কেইশোর বাগ পরিদর্শন করিয়া লা মার্টিনার (La Martinar) কলেজ ভবনটী পরিদর্শন করিলাম। কলেজ ভবনটী দেখিতে নিতান্ত সুন্দর ও জাঁকাল।

বিকাল বেলা আমরা "বেলিগার্ড" (Bailey Gaurd) পূর্ব্ব-তন রেসিডেন্সি দেখিতে গেলাম। লক্ষ্ণৌর মধ্যে এ স্থানটী একটি দেখিবার বিষয় বটে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের শিপাহী বিদ্রোহানলে যে সমস্ত ব্রিটিশ বীর পুরুষ ভষ্মীভূত হইয়াছিল, তাঁহাদের বিখ্যাত নামা কয়েক ব্যক্তি এ স্থানে সমাধিস্থ রহিয়াছেন। তাঁহাদের সমাধি স্তম্ভে কত কি পড়িয়া, সে অতীতের স্মৃতি আসিয়া, আবার আমাদের মনে জাগিয়া উঠিল। সমাধি স্তম্ভ গুলির মধ্যে কমিষণার লরেন্স সাহেবের সমাধি স্তম্ভই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও মনোহর। জেনেরেল হ্যাবলক (General Hablock) মেজর আউটরাম (Major

Outram) ও জেনেরেল নিল (General Neill) ও এস্থানে আপন আপন বীরগর্ব্ব ভুলিয়া, অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। যে স্থানে জেনেরেল নিল বিদ্রোহানলে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, সে স্থানে তাঁহার স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ একটী তোড়ণ (Gate) নির্ম্মিত হইয়াছে। তোড়ণের উপরিভাগে বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে "General Neill was killed here in the year 1857" (১৮৫৭ খৃঃ অব্দে জেনেরেল নিল এ স্থানে হত হইয়াছিলেন)। কলিকাতা পার্ক ষ্ট্রীটের সম্মুখে ঘোটকারোহণে যে বীর পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে, তাঁহারাই নাম মেজর আউটরাম। শিপাহী বিদ্রোহের সময়, বিশেষত ঝান্সী অবরোধের সময় তিনি অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া লক্ষ্ণৌর নিকটবর্ত্তী লালবাগ নামক স্থানে আমাশয় রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। রেসিডেন্সীর ভগ্নাবশেষ মাত্র এখন অতীতের সাক্ষী স্বরূপ দাড়াইয়া আছে। তাহার যে যে স্থান বন্দুকের গুলিতে অথবা কামানের গোলাতে যেরূপ বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিবরণ সহ তদ্রূপই রাখা হইয়াছে। সমাধিস্থানের দুই একটী সমাধি স্তম্ভের লেখা পড়িয়া, আমাদের হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য, তাহার দুএকটী আমরা নিম্নে অনুবাদ সহ প্রকাশ করিলাম। একটী অপোগণ্ড শিশুর সমাধি স্তম্ভে লিখিত আছে—

(1) This lovely bud so young and fair,

Called hence by early doom

Just came to show how sweet a flower,
In paradise would bloom.

অস্ফুট কোমল এই কলিকা রতন।
বাল্যেই করাল কাল নিয়েছে হরিয়া—
দেখাইবে বলি যেন হেন দরশন।
কেমনে স্বরগ কোলে ফুটিবে হাসিয়া।

অন্য একটী বালিকার সমাধি স্তম্ভে লিখিত আছে—

(2) Weep not for me my parents dear,
For I am not dead but sleeping here
And await a while you shall be,
In paradise along with me,

স্নেহময়ী মা আমার বাবা স্নেহময়,
কেঁদনা আমার তরে তোমরা দুজন।
আমি মরি নাই—হেথা নিদ্রা যাই,
তোমরাও কিছু দিন থাক ধরালয়,
স্বরগে সবার পরে হইবে মিলন।

এক স্থানে একটী শিশুর সমাধি স্তম্ভে হতভাগা পিতা অশ্রুজলে লিখিয়া রাখিয়াছেন——

(3) To lift the eye of faith to Heaven and think, my child is there. This best can dry the gushing tears, this yields the hearts relief.

বিশ্বাস-নয়ন যবে তুলি স্বর্গপানে,
ভাবি মোর বাছাধন আছে সেই স্থানে,

তাহাতেই শালদগু হয় নিবারণ,

তাহেই জ্বলন্ত হৃদে শান্তি সঞ্চালন।

আর একস্থানে একটী শিশুর সমাধিস্তম্ভে লিখিত আছে।

(4) Ere sin could blight or sorrow fade
Death came with friendly care.
The opening bud to Heaven conveyed
And bade it blossom there.

পাপের পঙ্কিল অঙ্কে না ডুবিতে হায়!

দুঃখের দারুণ তাপ না শুকাতে তায়,

শমন স্নেহের ভরে বন্ধু প্রায় ধরি করে

ফুটন্ত কলিকা এই স্বরগে লইয়া

ফুটাইতে সযতনে রেখেছে তুলিয়া।

আর একস্থানে লিখিত আছে "They that sow in tears shall reap in joy" (চক্ষুজলে যে বপন করিবে সে সুখে তাহা চয়ন করিবে)।

সমাধিক্ষেত্রে আমরা এরূপ শোক পীড়িত আরো কত কি পড়িলাম, স্থানাভাব বশতঃ তাহা পাঠকদিগকে জানাইতে পারিলাম না। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে সমস্ত দেশীয় লোক ইংরেজের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের স্মরণচিহ্নস্বরূপও একটী স্তম্ভ এস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা ইংরেজের নেহাত অনুগ্রহ! আমরা বেলিগার্ড দেখিয়া, গোমতী নদীর তীরে আসিলাম। গোমতী একটী

সাধারণ খালের মত। একটা নদী না থাকিলে শোভার অঙ্গ ভঙ্গ হয় ; তাহাতেই লক্ষ্ণৌর উত্তর বাহিয়া, গোমতী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে।

৩রা আগষ্ট (২০শে শ্রাবণ) আমরা "আজব ঘর" (মিউজিয়ম) পরিদর্শন করিলাম। ইহার প্রাচীন নাম "লাল বারদোয়ারি"। মিউজিয়মে একটী দৃশ্য দেখিয়া আমাদের প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। এস্থানে একটী পিস্তল রাখা হইয়াছে, তাহার বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, "১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহের সময়, এই পিস্তল দ্বারা দিল্লীর বাদসাহের একটী পুত্রকে বিনাশ করা হইয়াছিল।" ইংরেজ রাজ কি সে গৌরবের পরিচয় দিবার জনাই পিস্তলটী এত যত্নে, এত আদরে মিউজিয়মে রাখিয়া দিয়াছেন ?

৪ঠা আগষ্ট (২১এ শ্রাবণ) হইতে আমার শরীর নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। অপরিমিত গরমীই এরূপ হঠাৎ পীড়িত হওয়ার কারণ। আমরা লক্ষ্ণৌতে যাঁহার আশ্রয়ে ছিলাম, আমার ব্যারামের সময় তিনি যেরূপ বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ। গোমতী তীরে মরিলে গাধা হয়। মরিয়া যে একটা গাধা হইব, ব্যারামের সময় এ ভয় আমার মনে বড় ক্রিয়া করিতেছিল। যাহা হউক ৮ই আগষ্ট (২৫এ শ্রাবণ) আমার শরীর একটুকু সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন 'গাধা হওয়ার মহা' ভয় হইতে এক প্রকার অব্যাহতি পাইলাম। এখন ঘরে

বসিয়া থাকিতেও বড় বিরক্তি বোধ হয়। ভায়ার শরীর সুস্থ, ডাল রুটীর প্রতি এখন তাহার বেশ অনুগ্রহ—পঁচিশ ফর্দ্দ রুটী একবারে!! সে অন্যত্র বেড়াইতে গিয়াছে। অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় আমিও 'কেইশোর বাগে সদৎ খাঁর মকবুল (মসজিদ) দেখিতে গেলাম। চারিদিক সে সময় নীরব! দ্বিপ্রহরের রৌদ্র কিরণ বেশ প্রখর, সঙ্গে সঙ্গে গরম বাতাস বহিতেছে, সে সময় মকবুলের উপর বসিয়া, লক্ষ্ণৌর চারিদিকে চাহিয়া যেন হৃদয়ে কেমন এক নূতন ভাবের উদয় হইল। লক্ষ্ণৌর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, প্রাণ যেন কাঁদিতে লাগিল। আমি মকবুলের প্রাচীরে পেন্সিল দ্বারা লিখিয়া রাখিলাম।

"রাজা, প্রজা, ধনী, জ্ঞানী, নির্ধন, অজ্ঞান
কালের করাল করে সবাই সমান।
দুগ্ধফেণ শয্যা কিম্বা তৃণেতে শয়ন,
সকলেরি পরিণামে ধূলিতে শয়ন।
কেন তবে ভ্রান্ত জীব! নশ্বর সংসার!
বিষয়, বিভব, মান সকলি অসার!

লক্ষ্ণৌর পুরাতন রাজ ভবনটী (যাহার নাম ছত্রমুঞ্জিল) এখন একাউণ্ট আফিস ও ক্লাব গৃহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে কেল্লার দক্ষিণে "মচ্ছি ভবন" ও তাহার পশ্চিমে ইমাম বাড়াই প্রধান। ইমাম বাড়া দেখিতে অতি সুন্দর ও

মনোহর। ইমাম বাড়া মসজিদের পশ্চিমে হোসেনাবাদ নামে একটী বৃহদায়তনের দর্শনীয় মসজিদ আছে। এই মসজিদে অযোধ্যার একজন নবাব সমাধিস্থ হইয়াছেন। এই সমস্ত দ্রষ্টব্য বিষয় ভিন্ন লা মার্টিনারের নিকটে "সাহা নাজফ্" সমাধি মন্দির ও একটী দেখিবার বিষয়। কিন্তু নবাব বংশের রাজ্য নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত আজি নিতান্ত হীন-দশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে।

যযাতির নাম হইতে তাঁহার বাসস্থানের নাম "যাযমৌ" হওয়ার ন্যায়, লক্ষণ নাম হইতেও "লক্ষ্ণৌর" সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া, অযোধ্যা প্রত্যাগমন করিলে পর, তিনি প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে লক্ষ্ণৌ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহের শাসন ভার অর্পণ করিলেন। লক্ষ্মণ গোমতী তীরে একটী উচ্চ স্থান বাস্কীর প্রিয়ভূমি জানিয়া, তথায় আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন ও তাহার নাম "লক্ষ্মণপুর" রাখিলেন। তদবধিই ইহা হিন্দুদিগের অত্যন্ত পবিত্র স্থান। হিন্দুদ্বেষী আরঙ্জীব তাহার পবিত্রতা নাশে কৃত সঙ্কল্প হইয়া, সেস্থানে এক মসজিদ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহারই বর্ত্তমান নাম "মচ্ছি ভবনে" পরিণত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুগণ এখনও এস্থানকে লক্ষ্মণপুর' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। লক্ষ্মণপুরের অপভ্রংশ হইয়াই বোধ হয় বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ নামের সৃষ্টি হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরের অধীন ছিল। বাহাদুর সাহার

রাজত্ব কালে সদৎ খাঁ নামে জনৈক খোরাসানী বণিক এদেশে আসিয়া, দিল্লী দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি কার্য্য দক্ষতা গুণে ক্রমশঃ পদস্থ হইয়া, বিয়ানা দুর্গের সেনাপতি হইলেন। আবদুল্লা ও হোসেন আলী সৈয়দ ভ্রাতা দ্বয়ের চক্রান্তে, দিল্লীশ্বর তাহাদের করপুত্তলী হইলে পর, নিজাম উলমুলক মহম্মদ সাহার রাজত্ব কালে হাইদ্রাবাদ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিলেন। তদ্দর্শনে ১৭২১ খৃঃ অব্দে সদৎ খাঁও অযোধ্যা দিল্লীর সামন্ত রাজ্যে পরিণত করিয়া, তাহার সুবাদার হইলেন। এই সদৎ খাঁই দস্যুকুল চূড়ামণি পামর নাদীর সাহাকে ভারত আক্রমণে আহ্বান করিয়া, পরিশেষে তৎকর্ত্তৃক অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া, ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সদৎ খাঁ অযোধ্যার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সদৎ খাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র সফদরজঙ্গ অযোধ্যা সিংহাসনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাহা শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হইলেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত ব্রিটিশ রাজের বাকসারে এক যুদ্ধ হইয়া, তাহাতে তিনি পরাস্ত হইলেন। পলাশী যুদ্ধে যেমন ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের সূত্রপাত হইল, সেরূপ বাকসারের যুদ্ধক্ষেত্রেও উত্তর পশ্চিম ভারতে ইংরেজের একাধিপত্য স্থাপন করিবার পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত হইল। ইহার অনতি পরেই কোরাতে আর

এক যুদ্ধ হইয়া, অযোধ্যাপতি পরাস্ত হইলেন। অযোধ্যাও এক প্রকার ইংরেজের হস্তগত হইয়া পড়িল। কিন্তু লর্ড ক্লাইব নবাবকে উহা প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দৌলার পুত্র আসফউদ্দৌলা নবাব হইলেন। তিনিই লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ ইমাম বাড়ার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার মৃত্যুর পর উজীর আলী ওরফে মির্জা আলী নবাব হইলেন। তিনি কানুন পুত্র বলিয়া, ইংরেজ রাজ উজীর আলীকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দৌলার কনিষ্ঠ পুত্র সদৎ আলী খাঁকে—লক্ষ্ণৌতে ১০ সহস্র সৈন্য রাখিবেন, নবাব তাহাদের বেতন স্বরূপ ইংরেজ রাজকে বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন—প্রভৃতি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, হস্তপুত্তলি প্রায় অযোধ্যার সিংহাসনে বসাইলেন। আবার কিছু দিন পরে নিয়মিত রূপে উক্ত টাকা দানে অক্ষম হওয়াতে, তাঁহার নিকট হইতেই ইংরেজ রাজ ১৮০৩ খৃঃ অব্দে মোরাদাবাদ, বেরিলী, ইটোয়া, ফরেক্কাবাদ, আলাহাবাদ, কানপুর ও গোরক্ষপুরটী কাড়িয়া লইয়া, লক্ষ্ণৌতে একজন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিলেন।

১৮১৪ খৃঃ অব্দে সদৎ আলীর মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র গাজীউদ্দীন হাইদর অযোধ্যার নবাব হইলেন। তিনিই লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ "সাহানাজফ" সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, মৃত্যুর পর তাহাতে সমাধিস্থ হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অযোধ্যার নবাবগণ দিল্লীশ্বরের উজীর নামে অভিহিত হই-

তেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে গাজীউদ্দীন হাইদর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ক্রমে, অযোধ্যার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া, স্বাধীন রাজা (king) নামে অভিহিত হইলেন। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে গাজীউদ্দীনের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র নাছিরউদ্দীন হাইদর ও ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, সদৎআলীর কনিষ্ঠ পুত্র মহম্মদ আলী অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অযোধ্যা শাসন করিতে লাগিলেন; মহম্মদ আলীর মৃত্যুর পর (১৮৪৪ খৃঃ অঃ) তৎপুত্র আমজাদ্ আলী সাহা নবাব হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ওয়াজেদ আলী সাহা ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, বিলাশীতায় ডুবিয়া রহিলেন; আর স্বীয় রাজপ্রসাদে বসিয়া, পরিণাম-অন্ধের ন্যায়, স্বপ্রণীত লক্ষ্ণৌ ঠুংরিতে আপনার কোন এক প্রণয়িনীর মুখে প্রেমসঙ্গীত গাওয়াইলেন—

সাহাজাদে আলম্ তেরা লিয়ে
মায়তো জঙ্গল সাহারা বিয়াবানা ফিরোঁ।
তনু খাক মলোঁ পাহেনোঁ কপিনো
যোগিনী বনা বন ঢোরোঁ ফিরোঁ।
পূরবা পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ
দিল্লী সহর মুলতান ফিরোঁ।

এই ওয়াজাদ আলী সাহাই ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইংরেজের বন্দীবেশে—

যবে ছোড় চলি লক্ষনৌ নগরী
তেরা হালে আদম্ পরা ক্যা গুজারি।
আদামা গুজারি, সাদমা গুজারি,
যব হাম্ গুজারি দুনিয়া গুজারি ॥

গাইতে গাইতে প্রিয়ভূমি লক্ষ্ণৌর নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই ওয়াজেদআলীসাহা রাজ্য নির্ব্বাসিত হইলেই, লক্ষ্ণৌবাসী তাঁহার পরিণাম দেখিয়া ও তিনি বিলাত আপীল করিতে যাইতেছেন ভাবিয়া, হৃদয়ের দুঃখে গাইয়াছিল—

(এয়্সা) নিমক হারামে মুল্লুক বিগাড়া।
হজ্‌রত্ যাতেহেঁ লণ্ডন কো ॥
মহল্‌মে মহল্‌মে বেগম রোয়ে
গলই গলী রোয়ে পাথুরিয়া ॥

অবশেষে এই ওয়াজাদ আলী সাহাই ইংরেজের বৃত্তিভোগী রূপে, মেটেবুরুস (মুচী খোলার) উদ্যান বাড়ীতে বসিয়া, হৃদয়ের দুঃখে—

কোম্পানি বাহাদুর ক্যা, জুলুম কিয়া
মেরে মাল মুল্লুক সব ছিনা লিয়া।

আন্দর্ রোয়ে খানম্ বেগম্
বাহের রোয়ে সাহেলেনিয়া। *

গাইতে গাইতে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে জীবনের অবসান করিলেন।

লক্ষ্ণৌর গরমী ক্রমশই আমার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি আর তথায় থাকিতে পারিলাম না। গরমে থাকিলে শরীর ভাল থাকে। ভায়াকে কতক দিনের জন্য লক্ষ্ণৌর গ্রীষ্ম উপভোগ করাইতে লক্ষ্ণৌ রাখিয়া, আমি কানপুর রওনা হইলাম।

৮ই আগষ্ট (২৫ শে শ্রাবণ) বিকাল বেলা সকাল সকাল আহার করিয়া, লক্ষ্ণৌ ষ্টেষণে চলিয়া গেলাম। সন্ধ্যার সময় গাড়ী ছাড়িবে। ভায়াকে ছাড়িয়া যাইতে বড় কষ্ট বোধ হইল। কিন্তু লক্ষ্ণৌর জল বায়ু তখন আমার পক্ষে এরূপ অসহ্য হইয়া উঠিয়া ছিল যে, কতক দিনের জন্য বাধ্য হইয়াই ভায়াকে সেস্থানে রাখিয়া যাইতে হইল। সন্ধ্যার সময় গাড়ী চাপিয়া কানপুর রওনা হইলাম।

---

* উল্লিখিত গানগুলি সমস্তই খাম্বাজ রাগিনী ও লক্ষ্ণৌ ঠুংরি তালে গাইতে হয়। ওয়াজেদ আলী সাহাই লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সৃষ্টিকর্ত্তা। শোরী মিয়ার টপ্পা নামে আর এক জাতীয় মনোহর টপ্পা যে, প্রচলিত আছে; অনেকের বিশ্বাস—শোরীমিয়া নামক জনৈক প্রসিদ্ধ গায়ক ইহার রচয়িতা। বাস্তবিক শোরী মিয়া নামে কোন গায়ক জন্মগ্রহণ করেন নাই। গোলাম নবী নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ গায়ক এই সমস্ত সুমধুর টপ্পা রচনা করিয়া, স্বীয় প্রণয়িনী শোরীর নামানুসারে ইহার এরূপ নামকরণ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কানপুর—যয়্মৌ—বিঠুর।

রাত্রি দশটার পর গাড়ী আসিয়া কানপুর পৌঁছিল। কানপুর অপরিচিত স্থান, তাহাতে আবার রাত্রিকাল, এ সময় সহরে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সে রাত্রিটী এক সরাইতেই অতিবাহিত করিলাম।

কানপুরে আমাদের পরিচিত একজন বাঙ্গালী বাবু ছিলেন; লক্ষ্ণৌ পা——বাবুর বাসায় তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয়। প্রাতে উঠিয়া, প্রথমে তাঁহার বাসায় যাওয়াই স্থির করিলাম, পরে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, তাঁহার বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কানপুর আমাদিগকে অনেক দিন থাকিতে হইবে। এতদিন কাহারো গলগ্রহ হইয়া থাকা যুক্তি সঙ্গত নয়। আমি একখানা বাড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এখন ঘোর বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। এ সময় ভায়া লক্ষ্ণৌতে, আমি কানপুর, আমার যেন বড় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। ভায়াও দাদাকে ছাড়িয়া, অধিক দিন লক্ষ্ণৌ থাকিতে পারিল না। ১০ই আগষ্ট পূর্ব্বাহ্ন ১০টার সময় ভায়াও লঙ্কাবিজয়ীর ন্যায় কানপুরে আসিয়া উপস্থিত। সেই বিদেশে কেবল মাত্র দুই

দিনের ছাড়াছাড়ির পরই যেন, উভয়কে উভয়ে কত দিনের পর, দেখিলাম বলিয়া বোধ হইল। ভায়া কানপুর আসিলে পর, আমরা অন্যত্র থাকার বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। কানপুরে আমরা যাঁহার বাড়ীতে খাওয়ার বন্দোবস্ত করিলাম, তিনি একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ। পৌরোহিত্য তাঁহার জীবিকা। সম্পন্নাবস্থাপন্ন না হইলেও, তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের অপরিমিত যত্ন ও সদ্ব্যবহারে আমরা পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ।

কানপুর একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। ভাগীরথী ইহার উত্তর হইতে পূর্ব্বগামী হইয়া, দক্ষিণ পূর্ব্বে আলাহাবাদের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ইহার নাম ভগীরথ-গঙ্গা। সহরের দক্ষিণ ভাগেই কানপুর খাল (Canal) হরিদ্বারের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া, কানপুরে আসিয়া, গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার নাম কাটলী গঙ্গা। কেনেলের গঙ্গা সঙ্গম স্থলে একটী বাঁধ, জল আবদ্ধ রাখিবার জন্যই এই বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। কানপুরের দৃশ্য বড় সুন্দর। চতুর্দ্দিক রাশি রাশি নিমগাছে পরিপূর্ণ। তাহাতেই বোধ হয় কানপুর এরূপ স্বাস্থ্যকর স্থান। ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষেও কানপুর একটী বড় আড্ডা। এস্থানে নানাবিধ ডাল, গম, তিল, তিসি ইত্যাদি প্রচুর শস্যের আমদানী হইয়া থাকে। কানপুরে চামড়ার জিনিষ অতি সুলভ ও উৎকৃষ্ট।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় কানপুরে

যেরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, ভারতের অন্য কোথায়ও সেরূপ হয় নাই। কানপুর হত্যাকাণ্ড (Massacre) ভারত ইতিহাসের এক ভীষণ পরিচ্ছেদ!! "বিধর্ম্মী ইংরেজ খাদ্যে গো-অস্থিচূর্ণ ও শুকরের বসা মিশ্রিত করিয়া, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মনাশে যত্নপর"—এই জনরবে মিরাটে বিদ্রোহের সূত্রপাত হইলে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রায় অধিকাংশ ইয়োরোপীয় স্ত্রী পুরুষ নিরাপদ স্থান বোধে কানপুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

ইহার অনেক পূর্ব্বে কুড়িগাঁ, কির্কি ও আষ্টি সমরে পরাজিত হইয়া, শেষ পেশোয়া বাজী রাও ইংরেজ হস্তে বন্দী হইলেন। সুবিস্তীর্ণ পেশোয়া রাজ্য ইংরেজ-কবলে কবলিত হইল। পুনার রাজপ্রসাদ এখন ইংরেজের বিলাস ভবন। হায়! অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে মহারাষ্ট্র জাতি প্রায় সমগ্র ভারতে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; যে মহারাষ্ট্র জাতির বলবীর্য্যে দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় দ্বিতৃতীয়াংশ কম্পিত হইয়াছিল; যে মহারাষ্ট্র জাতির ভয়ে হাইদ্রাবাদের নিজাম প্রভৃতি রাজন্যবর্গ প্রতি বৎসর "মহারাষ্ট্র চৌথ" লইয়া, পুনার অধীশ্বর-দ্বারে উপস্থিত হইতেন, প্রাতঃস্মরণীয় শিবজীর, গুরু বংশোদ্ভব, সে মহারাষ্ট্র জাতির প্রধান পরিচালক শেষ পেশোয়া বাজী রাও এখন কেবল মাত্র বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া, ১৮১৮ খৃঃ অব্দে বিটুর নগরে নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু বাজী রাওর

মৃত্যুর পরেই ইংরেজ-রাজ তাঁহার বৃত্তিও বন্ধ করিয়া দিলেন। পুনার অধীশ্বর বাজী রাওর পোষ্যপুত্র নানা-ধুন্দুপান্থ ভারত-ভূমিতে এখন একজন সামান্য ভিকারীর ন্যায় পরের মুখাপেক্ষী! ইংরেজের এ অন্যায় ব্যবহার তিনি ভুলিতে পারিলেন না; প্রতিশোধ লইবার অনুসন্ধানে নিযুক্ত রহিলেন। মিরাটে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলে, নানা সাহেব বিঠুর হইতে কানপুর আসিয়া, তথাকার আশ্রয়ধারী ইয়োরোপীয়গণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহীদল এই সময় উহাদিগকে হুইলারস ইন্ ট্রেঞ্চমেণ্ট (Wheeler's Intrenchment) নামে একটা দুর্গবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া, উহাদিগের প্রতি ৪।৫ দিন অবিরাম গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। সে সময় ইয়োরোপীয়গণ আহারাভাবে এরূপ বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে যে, উহাদিগকে মৃত গরু, ঘোটক ও কুকুরের মাংস পর্য্যন্ত আহার করিতে হইয়াছিল। সে স্থানের বিশেষ কোন চিহ্ন এখন নাই। বিদ্রোহী সিপাহীদল কর্তৃক ইয়োরোপীয়গণ এরূপ প্রাণান্ত অত্যাচারিত হইয়া, নানা সাহেবের আদেশমতে, সাতখানা নৌকা আরোহণে, আলাহাবাদের দিকে রওনা হইল। বিদ্রোহীরা ও সে সময় গঙ্গার পাড় হইতে কামানের গোলা দ্বারা তাহাদের নৌকা ডুবাইয়া দিয়া, তাহাদিগকে নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে হত ও আহত করিল। সেই কামান রাখিবার স্থান এখনও ভাগীরথী তীরে

বর্ত্তমান রহিয়াছে। এরূপ অত্যাচারের পরও তাহাদের মধ্যে প্রায় ১১০০ এগার শত লোক জীবিত ছিল। লক্ষ্ণৌ হইতে ফৌজ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিতেছে জানিয়া নানা সাহেব তাহাদিগকে হত্যা করিয়া, হতওআহত সমুদয় হতভাগ্যকে একটী কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিলেন। তাহাদের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ সে স্থানে এখন একটী পরম সুন্দর উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার নাম 'স্মরণ উদ্যান' (Memorial garden)। উদ্যানটী নানাবিধ সুন্দর সুন্দর গাছে পরিপূর্ণ। ফুল পল্লবে সুশোভিত হইলেও, ইহা যেন শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে নীরবে বসিয়া, দর্শকগণকে অতীতের সে ভীষণ কাণ্ডের কথা বলিতেছে বলিয়া বোধহয়। উদ্যানের উত্তর প্রান্তেই সেই ভীষণ কূপ। এই কূপের গর্ভেই প্রায় এগার শত ইয়োরোপীয় স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকার দেহাবশিষ্ট আজিও নিহিত রহিয়াছে। এই কূপই নানা সাহেবের ক্রোধ-ভস্মীভূত হতভাগ্য ও হতভাগিনীদের সমাধি স্থান হইয়াছে। এখানেই তাহারা এ জীবনের তরে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত। এই কূপ এখনও ইয়োরোপীয়দিগের মনে দারুন ভীতি সঞ্চার করিয়া, শিপাহী বিদ্রোহের সেই ভীষণ কাণ্ড, তাহাদের মনে জাগাইয়া দিতেছে। কূপটীর নাম "স্মরণকূপ" (Memorial well) শ্বেত প্রস্তরে ইহার মুখবন্ধ এবং চতুর্দ্দিক শ্বেত প্রস্তরে মণ্ডিত। তাহার সম্মুখ ভাগে একটী শ্বেত প্রস্তরের পরী (Fairy) দুইটী

পাখা বিস্তার করিয়া অবনত মস্তকে দাড়াইয়া আছে; দেখিলে বোধ হয় যেন, সমাহিত ব্যক্তিদিগের তৎকালীন অবস্থা ভাবিয়া, প্রাণের ব্যথায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। কুপটীর চারি দিকে লেখা আছে—

Sacred to the perpetual memory of a great company of Christian people chiefly women and children, who near this spot, were cruelly massacred by the followers of the rebel Nana Dhontoo Pantho of Bittor, who cast the dyings with the dead, into the well below, on the 15th day of July 1857.

("১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ১৫ই জুলাই এই কূপের নিকট বিটুর নগরের নানা ধুন্ধু পান্থের অনুচর বর্গ কর্ত্তৃক অসংখ্য ইয়োরোপীয় স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়! তাহারা আহত ব্যক্তিদিগকেও হত ব্যক্তিদিগের সহিত এই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহাদের পবিত্র স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ ইহা নির্ম্মিত হইল।")

বাস্তবিক মেমরিয়েল গার্ডন দেখিয়া আমরাও বড় শোক সন্তপ্ত হইয়াছিলাম! উদ্যানের মধ্যে কাহারও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবার ও গান করিবার অধিকার নাই। দর্শকবৃন্দকেও শোকার্ত্তের ন্যায় তাহা পরিদর্শন করিতে হয়। দেশীয় পরিচ্ছদধারী দেশীয়দিগের উদ্যান দেখিবার জন্য, একখানা পাশ আবশ্যক করে। কিন্তু কোট পেণ্টলেন পরিধানে থাকিলে, সকলেই বিনা পাশে উদ্যান

পরিদর্শন করিতে পারে। ইহা না জানাতে, আমাদিগকে তথাকার জজ সাহেবের নিকট হইতে এক খানা পাশ আনাইয়া, উদ্যান পরিদর্শন করিতে হইয়াছিল।

১১ই শ্রাবণ আমরা মেমরিয়েল চার্চ্চ (Memorial church) ও মেমরিয়েল হোটেল (Memorial Hotel) পরিদর্শন করিলাম। মেমরিয়েল চার্চ্চটী দেখিতে বড় সুন্দর। দেওয়ালের গায় শিপাহী বিদ্রোহ-কাণ্ডের দৃশ্য সকল চিত্রিত। কোথাও কোন সাহেব কোন শিপাহীর পা ধরিয়া, প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছে, আর শিপাহী তাহাকে বধ করিবার জন্য তরবারী তুলিয়াছে। কোথাও বা কোন সাহেব ও বিবি কোন বিদ্রোহী কর্ত্তৃক নিহত হইয়া, রক্তাক্ত কলেবরে পড়িয়া আছে। এরূপ নানা বিধ চিত্রে গির্জ্জাটী চিত্রিত। গির্জ্জার নিকট দ্বিতীয় সংখ্যক বেঙ্গল অশ্বারোহী সেনার মেজর এড্ওয়ার্ড ভিলার্ট (Edward Vilart) সাহেবের ও অন্যান্য অনেক অনেক আফিসারের সমাধি। কানপুর বিদ্রোহের সময় এই সমস্ত ব্রিটিষ-বীর প্রাণ ভয়ে পলায়ন পর হইয়া, শিপাহীগণ কর্ত্তৃক এই গির্জ্জার নিকট ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন। তাহাদের স্মরণ চিহ্ণ স্বরূপ এই গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। মেমরিয়েল হোটেলে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। এস্থানেও অনেক পলায়িত ইয়োরোপীয় বিদ্রোহীদিগের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইয়াছিল।

“যযমৌ’—কানপুরের অনেক দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

লোকে ইহাকেই নহুষ তনয় যযাতি রাজার বাড়ী বলিয়া,অভিহিত করে। সেস্থানে রাশি রাশি মৃত্তিকা স্তূপ ভিন্ন প্রাচীন কালের অন্য কিছুই এখন আর দেখিবার নাই। যযমৌর এক স্থানে একটী উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ আছে; লোকে বলে সেস্থানেই যযাতি রাজার সিংহাসন স্থাপিত ছিল। জাহ্নবী আজিও বর্ত্তমান, কিন্তু একবার জরা-দায় হইতে মুক্ত হইয়াও, মহারাজা যযাতি কালের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিলেন না।

বিটুরনগর কানপুরের উত্তরে অবস্থিত। ইহাই মহামুনি বাল্মীকির আশ্রম ও হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতিবৎসর রাশি রাশি লোক তীর্থ দর্শনার্থে এস্থানে আগমন করিয়া থাকে। ত্রেতাযুগে এই বিটুরেই রামচন্দ্র সসত্ত্বা সীতাকে লোকলজ্জা ভয়ে বনবাস পাঠাইয়া, ভবিষ্যত-লবকুশ-যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কলিযুগেও ইংরেজ রাজ বাজীরাও পেশোয়াকে স্বসত্ত্বে নিঃসত্ত্ব করিয়া, "চক্ষুলজ্জা ভয়ে" এস্থানে বনবাস পাঠাইয়া, ভবিষ্যত শিপাহী যুদ্ধের সূত্রপাত করিলেন। এই জন্যই বোধহয় ইংরেজ-রাজত্ব রাম-রাজত্ব নামে সুপ্রসিদ্ধ। ইংরেজ রাজত্বেও অনেক নির্দোষীর বনবাসের বিশেষ ত্রুটি হয় নাই।

নানা কারণে, আমাদিগকে অনেক দিন কানপুরে থাকিতে হইয়াছিল। আমার শারীরিক দুর্ব্বলতা এখন সারিয়াছে। ২০এ আগষ্ট কানপুর ত্যাগ করিয়া, আমরা ট্রেণে আগ্রা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

আগ্রা—সেকেন্দ্রা।

যে রাত্রে আমরা কানপুর পরিত্যাগ করিলাম, তাহার পর দিবস আমাদের গাড়ী আসিয়া টুণ্ডলাতে পৌঁছিল। টুণ্ডলা হইতে দুটী রেলওয়ে, একটী দিল্লী অভিমুখে, অন্যটী আগ্রার দিকে চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে আগ্রা যাইতে হইবে। টুণ্ডলাতে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া,আমরাআগ্রাভিমুখে রওনা হইলাম। আগ্রা ও টুণ্ডলার মধ্যবর্ত্তী স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভিন্ন প্রকৃতির। কোথাও কোন পাহাড় নাই; তবু যেন স্থান গুলি নিতান্ত নীরস, ও অনুর্ব্বর বলিয়া বোধ হইল। রেলপথের দুদিকে গাছে, মাঠে, নানা স্থানে রাশি রাশি ময়ূর বসিয়া আছে, গাড়ীতে বসিয়াই আমরা এ মনোহর দৃশ্য দেখিতেপাইলাম। বেলা ৯৷৷৹টার সময় আমাদের গাড়ী আগ্রার নিকটবর্ত্তী হইল। তৎপর ক্রমশঃই যমুনার নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, আগ্রার দৃশ্য আমাদের নয়নে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। যমুনার পুলের উপর গাড়ী পৌঁছিলে, আমরা বাম দিকে একটী শ্বেতবর্ণের মসজিদ দেখিতে পাইলাম। উহাই যে জগৎ বিখ্যাত তাজ মহল, আমরা তখন তাহা ভাবি নাই। তখন উহা একটী শ্বেতাবধৌত (white wdashed) মসজিদ বলিয়াই

স্থির করিয়াছিলাম। যমুনার অপর পাড়ে চন্দন প্রস্তর (Saddle stone) নির্ম্মিত আগ্রার কিল্লা। কিল্লার নিকটেই রেলওয়ে ষ্টেষণ। আমাদের গাড়ী আসিয়া ষ্টেষণে পৌছিলে, আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই, প্রথমে কোন বাঙ্গালী বাবুর অনুসন্ধান করিলাম। তখন ১০ টা বাজিয়া গিয়াছে, আগ্রা পিপলমণ্ডীতে একটী বাঙ্গালী বাবু ছিলেন; তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া জানিলাম, তিনি আফিসে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা অগত্যা থাকিবার জন্য একটী সরাইতে ফিরিয়া আসিলাম। তথায় একটী ঘর ভাড়া করিয়া, আহার ইত্যাদি সমাপন করিলাম। গোয়ালিয়র হইতে আর এক দল মোসাফির (যাত্রী) সরাইতে আসিয়া, অন্য গাড়ীর প্রতীক্ষায় বিশ্রাম লইতেছিল। কতক্ষণ তাহাদের সহিত গোয়ালিয়র সম্বন্ধে আলাপ করিয়া, ভায়াতে আমাতে সুখে নিদ্রা গেলাম। বেলা যখন ১॥০ টা কি ২ টা, সে সময় এক জন মুসলমান নানাবিধ যন্ত্র লইয়া, আমাদের কাণ দেখিতে উপস্থিত হইল। শরীর কবিয়া আমার কাণ "বড় 'ভোঁ ভোঁ' করিতেছিল; আমি নরসুন্দর মহাশয়কে কাণ দেখাইতে স্বীকৃত হইলাম। সেখজী আমার কাণ হইতে ময়লা বাহির করিতে লাগিল। দেখি সে প্রায় এক নরদামার ময়লা আমার কাণ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। তবু নরসুন্দর সেখজী বলে, আমার কাণে আরো ময়লা আছে। সমুদয় ময়লা বাহির করিবার জন্য, আমি তাহাকে আরো পয়সা

দিতে স্বীকৃত হইলাম। সেও আমার কাণ হইতে হাতের ছাপাইতে আরো নূতন ময়লা বাহির করিয়া, এক সেলাম বাজাইয়া বিদায় লইল। শেষে তথাকার একটী লোকের নিকট শুনিলাম, মুসলমান নাপিত আমাকে প্রতারণা করিয়া, পয়সা গুলি আদায় করিয়াছে। উহারা নাকি হাতে ময়লা রাখিয়া, তৎপ্রদর্শনে মোসাফির (যাত্রী) দিগকে সর্ব্বদা এরূপে ঠকাইয়া থাকে। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কখন ও আগ্রা গেলে, যাহাতে এরূপ প্রবঞ্চকদিগের নিকট প্রতারিত না হন, তৎজন্যই আমরা আগ্রা নরসুন্দরদের এ প্রচলিত জুয়াচুরি পাঠকবর্গকে জানাইলাম।

অপরাহ্ন চারিটার পর আমরা পুনরায় পূর্ব্বোক্ত বাবুটীর বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীতে যাওয়া মাত্রই তিনি বাহিরে আসিয়া, আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। বাবুটীর নাম শ্রীযুক্ত বাবু বে—, তিনি আগ্রার অর্ডেনস্ (Ordance) ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করেন। পূর্ব্বে পেশোয়ারে বিষয় কর্ম্ম করিতেন, অল্প কয় দিন হইল বদলী হইয়া, আগ্রা আসিয়াছেন। বে—বাবু আমাদিগকে পাইয়া, নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। আমাদের আগ্রা অবস্থান কালীন, তাঁহার বাড়ীতে আমরা এরূপ সমাদর-আদর ও সুখ, স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতেছিলাম যে, তাঁহার সদয় ভদ্র ব্যবহার আমরা চির জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না।

আগ্রা বাদসাহী সহর, বাদসাহ আকবর কর্ত্তৃক ইহা

নির্ম্মিত হইয়াছে। আগ্রার প্রাচীন নাম অগ্রবন। আকবর ইহার আকবরাবাদ নাম রাখেন। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে এস্থানে কোন্ হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন নিদর্শন নাই। মোগল কুলতিলক আকবরের রাজত্ব কালে আগ্রা ভারতের রাজধানী রূপে শোভা সমৃদ্ধিতে যমুনা-তীর সাজাইয়া রাখিয়া ছিল। এই আগ্রাতেই এক সময় ভারত ইতিহাসের কত অভিনয় অভিনীত হইয়া গিয়াছে। মোগল রাজত্বের শেষভাগে আগ্রা মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃঃঅব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ইংরেজ রাজ সির্জ্জি অঞ্জনগাঁর সন্ধি অনুসারে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার নিকট হইতে ইহা ব্রিটিশ রাজ্য ভুক্ত করিয়া লইলেন।

২২ শে আগষ্ট এক খানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, আমরা তাজ মহল দেখিতে যাত্রা করিলাম। যমুনা আগ্রার পূর্ব্ব সীমা বাহিয়া, আবার আলাহাবাদের দিকে পূর্ব্বগামী হইয়াছে। যমুনার সে বক্রতীরে আগ্রার দক্ষিণে তাজমহল অবস্থিত। তাজমহল যাওয়ার কালীন যমুনা তীরে বীরবলের বাড়ী দেখিয়া গেলাম। বীরবলের বাড়ীর এখন বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। রাশি রাশি মৃত্তিকা স্তূপ, অতীতের সাক্ষী স্বরূপ যমুনা-তীরে বিরাজ করিতেছে। আমাদের প্রদর্শক (Guide) উহা মোগল সম্রাটের রাজস্ব সচিব বীরবলের বাড়ী বলিয়া, আমাদিগকে তাহার বৃত্তান্ত জানা-

ছেন। আমরা সে স্থান অতিক্রম করিয়া, তাজমহলের তোরণ সমীপে উপস্থিত হইলাম।

তাজ মহলের শিল্প সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়গণের বিশ্বাস, সাজাহানের রাজত্ব কালে আগ্রা দরবারে অষ্টিন্ ডি বর্ডিয়াক্স্ (Austin de Bordiaux) নামক একজন নক্সানবিস্ ছিলেন। তাঁহার নকসা অনুসারেই তাজমহল নির্ম্মিত হইয়াছে। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। তাজমহলের ভিতরে প্রবেশ কালীন, প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে উহার নির্ম্মাণ কর্ত্তার নাম এরূপ ভাবে লিখিত রহিয়াছে—"গরীব ফকির আমানত খাঁ সিরাজী"। ইহাতে বোধ হয়, অষ্টিনের নকসা অনুসারে তাজমহল নির্ম্মিত হইলে; তাঁহার ও নাম তাজমহলে খোদিত থাকিত। আমাদের বিশ্বাস—সাজাহানের চুঁচড়া অবরোধের পর, যে সমস্ত পর্ত্তগীজ স্ত্রী পুরুষ মুসলমান হস্তে বন্দী হইয়া, আগ্রাতে প্রেরিত হয়, অষ্টিন্ ডি বৌর্ডিয়াক্স্ও তাহাদের একজন—পর্ত্তগীজ বোধে বন্দী হইয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ও অষ্টিন্ ডি বৌর্ডিয়াক্সের পরিবর্ত্তে, "ওস্তাদ ইসু" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ওস্তাদ ইসু আমানত খাঁর নিকটই ভাস্কর বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, আগ্রা দরবারে নক্সানবিশি পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় মুসলমান স্ত্রীর গর্ভ-জাত পুত্র মহম্মদ সেরিফ্ এই পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। "অষ্টিন" নামের ন্যায় দিল্লী ও আগ্রার দু একটী সমাধি গাত্রে এখনও দু একটী পর্ত্তুগীজ

ও ইতালীয় নামের আভাস পরিলক্ষিত হয়। তদ্দৃষ্টে ইয়ো রোপীয়গণ দিল্লী ও আগ্রা দরবারের যত কিছু শোভা সমৃদ্ধি, তাহার নির্ম্মাণ উক্ত ইয়োরোপীয়দিগের অনুকৃত বলিলেও আমাদের আপত্তি করিবার কোন যো থাকে না।

তাজমহল সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে, এক দিন ভারতেশ্বর সাজাহান, ভারতেশ্বরী মমতাজ বেগমের সহিত শতরঞ্চ খেলিতে ছিলেন। সে সময় রূপময়ী তাজমহল আপনার পরম সুন্দর মুখখানা আরো হাসি-বিকশিত করিয়া, শীতল স্নেহ দৃষ্টিতে বাদসাহের দিকে চহিতে চাহিতে বলিলেন "স্বামিন্! এ হতভাগিনী তোমাকে রাখিয়া আগে মরিলে, তাহার জন্য তুমি কি করিবে?" ভারতেশ্বর এ রূপ সাগরে ডুবিয়া,—তাঁহার হৃদয় আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি হৃদয়ের সে অমূল্য ধনকে একবারে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া, একটী চুম্বন করিয়া, বলিলেন "প্রাণাধিকে বিধাতার যদি এরূপই ইচ্ছা হয় যে, তিনি তোমাকে আমা হৃদয় হইতে আগে কাড়িয়া লন, তবে তোমার হতভাগ্য স্বামী তাহার যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও, তোমরি সমাধি মন্দির এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিবে যে, তাহাতে যেন তোমার পবিত্র নাম জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে?" সাজাহান এ বলিয়া, আবার মমতাজের রক্তিম কপোলে আর একটী চুম্বন মুদ্রিত করিলেন ও পরে উভয়ে আবার খেলায় নিযুক্ত হইলেন। ইহার কিছু দিন পরেই স্বামী সোহাগিনী ম

তাজ মহল গর্ভবতী হইলেন। বিধাতার কোন লীলায় জানিনা,—গর্ভের আট মাস কাল অতীত হইলে পর, একদিন তাঁহার গর্ভ মধ্যেই গর্ভস্থ শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হইল। বাদসাহ এ সংবাদ শুনিয়া, বড় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। নানা দেশ হইতে খ্যাত নাম্মা ধাত্রীগণ আনীত হইল। কালের গতি কে অবরোধ করিবে? যথা সময়ে একটী কুমারী প্রসব করিয়া, তাহার দুঘণ্টা পরেই মমতাজমহল এই নশ্বর পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। হায়! বিবাহের পর কেবল মাত্র ২০ বৎসরকাল স্বামী সহবাস করিয়া, মমতাজ মহল ভারতেশ্বর সাজাহানকে অতল দুঃখে ডুবাইয়া, আজি পলায়ন করিলেন। স্নেহময় স্বামী নিজ প্রতিজ্ঞা ক্ষণকালের জন্য ও বিস্মৃত হননাই। মমতাজের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সমাধির উপর জগতবিখ্যাত তাজমহল নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। কথিত আছে, ন্যূনাধিক বিশ সহস্র শিল্পী নিযুক্ত থাকিয়া, বাইশ বৎসরে এই মহাহর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাজ-মহল জগদ্বিখ্যাত নুরজাহানের ভ্রাতা "আসফ্ জাহার" কন্যা। আসফ্ জাহারই ভ্রাতার নাম ইতামুদ্দৌল্লা। তাজ মহলে মমতাজ মহলের সমাধি মঞ্চে তাঁহার নাম "মমতাজ মহল রমু বেগম" ও তাঁহার মৃত্যুর সময় ১০৩১ হিজিরা শক (১৬৩১ খৃঃঅব্দ) ও সাজাহানের সমাধি মঞ্চে তাঁহার মৃত্যুর সময় ১০৬৬ হিজিরা শক (১৬৬৬ খৃঃ অব্দ) লিখিতআছে।

তাজমহলের দক্ষিণ ভাগে একটী পরম সুন্দর উদ্যান।

উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী কৃত্রিম পুকুর, তাহাতে রাশি রাশি লালমাছ। পূর্ব্বে এ পুকুরটীতে অনেকগুলি ফোয়ারার কল ছিল, কিন্তু এখন তাহা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও গণ্ডমূর্খ হইয়া রহিয়াছে। উপকথার ন্যায় তাজমহলের গল্প শুনিয়াছি, উদ্যান অতিক্রম করিয়া, কত কৌতূহলে আমরা সে তাজমহলের নিকটবর্ত্তী হইলাম। গত দিবস গাড়ীতে বসিয়া, যমুনার পুলের উপর হইতে যে শ্বেতধৌত মসজিদ দেখিয়াছিলাম, এখন দেখি তাহাই সেই জগদ্বিখ্যাত তাজমহল; যমুনা তীরে দাঁড়াইয়া আপনার পবিত্র শ্বেতছায়া আপনি পরিদর্শন করিতেছে। তাজমহল বিশুদ্ধ শ্বেত প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। চন্দ্রালোকে তাজমহল আরো শুভ্রতর পরিলক্ষিত হয়। আমরা বাহিরে জুতা রাখিয়া, তাজমহলে প্রবেশ করিলাম। তাজমহলের নিম্নতলে দিল্লীশ্বর সাজাহান ও তৎসম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের সমাধি দ্বয়। সমাধি গর্ভে সাজাহান প্রণয়িনীকে বাম পার্শ্বে হৃদয়ের নিকট রাখিয়া, সাম্রাজ্য সুখ ভুলিয়া, অনন্ত নিদ্রায় শায়িত রহিয়াছেন। এখন আর একে অন্যকে দেখিয়া উন্মত্ত নয়। এখন আর উভয়ে উভয়ের প্রেম আলাপন শুনিয়া, আত্ম বিস্মৃত হইতেছেন না। এখন উভয়েই নীরব। হায়! যে মমতাজমহলের অনুপম রূপে বাদসাহ পুরী শচীপুরী সাজিয়া ছিল, সে মমতাজমহলের সে অনুপম রূপ রাশি আজি এ সমাধি বক্ষে চূর্ণীকৃত!! হায়! যে সাজাহান একদিন অনন্ত রত্ন খচিত ময়ূরাসনে বসিয়া, রাজ দণ্ডকরে

সমগ্র ভারত রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন, আজি সে সাজা-হানও, সে ঐশ্বর্য্য মত্ততা ভুলিয়া, প্রাণাধিক প্রিয়তমার পার্শ্বে শায়িত আছেন। প্রকৃতির এরূপই নিষ্ঠুর লীলা খেলা !! সমাধি মঞ্চদ্বয় নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তরে কারু খচিত। তাজমহলের মধ্য প্রাচীর নানাবিধ লতাপাতা, ফুলফলে চিত্রিত। শ্বেত প্রস্তরে নানা রঙ্গের মূল্যবান প্রস্তর বসাইয়া, সে সমুদয় চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। প্রাচীরের উপরিভাগে, প্রস্তুর বসাইয়া, কোরাণের বয়ান সকল লিখিত রহিয়াছে। দরজাগুলি সমুদয়ই চন্দন কাষ্ঠের। তাজমহলের ভিতরকার দৃশ্য দেখিয়া, আমরা মনে ভাবিলাম, হায়! যে ভারতে পূর্ব্বে শিল্পের এত উৎকর্ষ ছিল, আজি সে ভারত শিল্পাভাবে মৃতপ্রায়। যে মোগল সম্রাট তাজমহল রূপ মহাহর্ম্য রাখিয়া, জগতে আপনাদের ঐশ্বর্য্য রাশির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, সে মোগল সম্রাটের বংশধরগণ আজি কোথায়? আজিও যমুনাতীরে তাজমহল বর্ত্তমান, কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের নাম আজি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

তাজমহলের নিম্নতলে কয়েকজন মুসলমান, একখানা রেকাবে কয়েকটী টাকা রাখিয়া, সমাধি মঞ্চের নিকট গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকে। উক্ত টাকা গুলি দর্শকেরা দিয়াছেন বলিয়া, নূতন দর্শকদিগের নিকট হইতেও তাহারা কিছু পাইবার জন্য প্রার্থনা করে। বাস্তবিক ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা; সচরাচর দর্শকেরা উহাদিগকে আপন ইচ্ছায় দু আনা চারি

আনা ভিন্ন দেয় না। রাত্রি প্রভাত হইলে উহারা রেকাবিতে উক্তরূপ টাকা সাজাইয়া, সমাধি মঞ্চের নিকট রাখিয়া বসিয়া থাকে, যাহা দর্শকেরা এত টাকা দেখিয়া, উহাদিগকে দুচার আনা দিতে কখনো সাহস পায় না। আমরা দর্শনী স্বরূপ উহাদিগকে একটী আধুলী দিয়া, উপরের গৃহ দেখিবার জন্য উপরে উঠিলাম। দ্বিতল গৃহেও সাজাহান ও মমতাজমহলের কৃত্রিম সমাধি মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতল গৃহের প্রাচীর গাত্র আরো সুন্দর, আরো মনোহর মূল্যবান প্রস্তরে চিত্রিত। মোগল রাজত্বের শেষ ভাগে ১৭৭৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত আগ্রা ভরতপুর বাসী যোদ্ধ জাতি জাঠ দিগের দখলে ছিল। তৎপর নাজির খাঁ কর্ত্তৃক উহার পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। সে সময়েই জাঠগণ তাজমহল ও অন্যান্য বিখ্যাত হর্ম্ম্যরাজীর মূল্যবান প্রস্তর ও রত্ন রাজী অপহরণ করিয়াছে। বাস্তবিক মোগল সাম্রাজ্যের শেষভাগে যোদ্ধ জাতি জাঠগণ, মোগল সাম্রাজ্যের নিতান্ত ভয়ের কারণ হইয়াই উঠিয়াছিল।

আমরা তাজমহলের দ্বিতল ও নিম্নতল পরিদর্শন করিয়া, তাজমহল স্তম্ভ (Monument) দেখিতে বাহির হইলাম। তাজমহল প্রাঙ্গনের চারিভাগে চারিটী স্তম্ভ নির্ম্মিত। আমরা তাহার একটী স্তম্ভের উপর উঠিয়া, মোগল রাজধানী আগ্রার দৃশ্য দেখিলাম। পরে নামিয়া আসিয়া, তাজমহল-তল বাহিনী নির্ম্মল সলিলা যমুনার শোভা দেখিতে লাগিলাম। তাজমহলের উত্তর পদ ধৌত করিতে করিতে, যমুনা পূর্ব্ব

দিকে চলিয়া গিয়াছে ! মৃদু সমীরে যমুনার ক্ষুদ্র বীচিমালা দেখিয়া কবির সে গানটী আসিয়া মনে পড়িল। তখন হৃদয়ের দুঃখে গাইলাম—

নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তট শালিনী সুন্দর যমুনেও ! ধ্রু
কত কত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষিও।
পড়িজল নীলে ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নব অঞ্জন ও ॥
যুগ যুগ বাহি প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনাও ॥
তব জল বুদ্বুদ সহ কত রাজা
পরকাশিল লয় পাইল ও ॥
কল কল ভাষে বহিয়ে কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতনও,
স্মরণে আসি মরমে পরশে কথা
ভুত সে ভারত গাথাও ॥
তব জল কল্লোল সহ কত সেনা
গরজিল কোন দিন সমরেও,

আজি সব নীরব রে যমুনে সব
গত যত বৈভব কালেও।
শ্যাম সলিল তব লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব কুরুকুল শোণিতেও,
কাঁপিল দেশ তুরগ গজ ভারে
ভারত স্বাধীন যে দিনও।
তব জল তীরে পৌরব যাদব
পাতিল রাজ সিংহাসন ও,
শাসিল দেশ অরিকুল নাশি
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ পতাকা
উড়িতে দেশে বিদেশে ও,
তিব্বত চীনে ব্রহ্ম তাতারে
ভারত স্বাধীন যেদিন ও।
কভু শত ধারে এ উভ পাড়ে
পাঠান আফগান মোগল ও,
ঢালিল সেনা ত্রাসি নিবাসী
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও।

অহ ! কি কু দিবসে গ্রাসিল রাহু
মোচন না হইল আর ও,
ভাঙ্গিল চূর্ণিল উলটী পালটী
লুটিনিল যা ছিল সার ও।
সে দিন হইতে শ্মশান ভারত
পর-অসি-ঘাত-নিপাতে ও,
সে দিন হইতে অন্ধ মনোগৃহ
পরবল-অর্গল-পাতে ও।
সে দিন হইতে তব জল তরলে
পরশেনা কুলবালা ও,
সে দিন হইতে ভারত নারী
অবরোধ অবরোধিত ও।
সে দিন হইতে তব তট গগনে
নুপুর নাদ বিনীরব ও,
সে দিন হইতে সব প্রতিকূলে
যে দিন ভারত বন্ধন ও। *

সাজাহান বাদসাহের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর, যমুনার

এই গানটী লয়ী রাগিনী ও যৎ তালে গাইতে হয়।

অপর পাড়ে তাঁহারও দেহ সমাধিস্থ হইয়া, তাজমহলের সদৃশ আর একটী হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় কারাবাস ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে আশা শূন্যে মিশিয়া গেল। সুপুত্র আরঙ্গজীব পিতার মৃত্যুর পর, পিতার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিলেন না। এখনও যমুনা তীরে তাহার ভিত্তি মাত্র পরিলক্ষিত হয়।

যমুনার জল-স্রোত দেখিয়া, তাহার তীরে তাজমহল দেখিয়া, অতীতের কত কথা আসিয়া, আমাদের মনে পড়িল। দুঃখে যমুনা জলে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া, আমরা সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। আসিয়া জুম্মা মসজিদ পরিদর্শন করিলাম। জুম্মা মস্‌জিদ একটী প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য। তাহার চারি কোণে চারিটী স্তম্ভ (Monument) বিরাজিমান। সেখানেও জুতা ছাড়িয়া, আমাদিগকে জুম্মা মস্‌জিদ দর্শন করিতে হইল। আমরা স্তম্ভে উঠিয়া, আবার আগ্রার দৃশ্য দেখিলাম ও পরে প্রায় বেলা ১০॥টার সময় ক্লান্ত হইয়া, গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

২০শে আগষ্ট—আমরা আগ্রার কিল্লা পরিদর্শন করিতে সচেষ্ট হইলাম। কিল্লা পরিদর্শন করিতে, ব্রিগেডিয়ার জেনেরেলের (Brigadier General) এক খানা পাশ আবশ্যক করে। কিল্লার মধ্যেই বে—বাবুর আফিস। তিনি প্রাতেই ব্রিগেডিয়ার জেনেরেলের নিকট হইতে একখানা পাশ আনাইয়া রাখিলেন। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আমরা

বে—বাবুর সহিত কিল্লা পরিদর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। আগ্রার কিল্লাই পূর্ব্বে মোগল সম্রাট দিগের আগ্রার রাজ-ভবন ছিল। ইহার তিনদিকই সুগভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত। পূর্ব্বসীমায় যমুনা পুলিনে একটী পথ উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। আমরা একটি সেতু দ্বারা পরিখা পার হইয়া, কাশ্মীর তোড়ণ (Cashmere gate) অতিক্রম করিলাম। তৎপর আর একটী তোড়ণ অতিক্রম করিয়া,দুর্গে প্রবেশ করিলাম। কিল্লার পশ্চিম প্রান্তে একস্থানে কতক গুলি কামান ও গোলা গুলী রক্ষিত। পূর্ব্বে কিল্লায় "দর্শন দরওয়াজা" নামে একটী দুর্গ দ্বার ছিল। বাদসাহগণ সেস্থানে বসিয়া,যমুনা পুলিনে হস্তী, মহিষ, সিংহ ও ব্যাঘ্র ইত্যাদি পশুর যুদ্ধ দেখিতেন। বাদসাহ আকবর জয়মল ও পুত্ত নামে চিতোরের দুই সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত বীরের স্মরণার্থে, এই কটক প্রান্তে হস্তী পৃষ্টে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়াছিলেন। সাজাহান তাহা দিল্লীতে লইয়া যান। তাঁহাদের বিবরণ চিতোর ইতিহাসে দ্রষ্টব্য। কিল্লার অপর একটী তোড়ণের পূর্ব্ব নাম "বোখারা দরওয়াজা" ও বর্ত্তমান "নাম অমরা সিংকা ফটক।" এই ফটক সম্বন্ধে মহাত্মা টড্ প্রণীত রাজস্থানে লিখিত আছে—অমর সিংহ মারওয়ারের (যোধপুর) রাজা গজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্বভাবের ঔদ্ধত্য বশতঃ পিতাকর্ত্তৃক অপতারিত হইয়া, তিনি দিল্লীশ্বর সাজাহান বাদসাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে স্বীয় ফৌজে এক মানসুবাদারী পদে নিযুক্ত করি-

লেন। এক সময় অমর সিংহ পক্ষকাল দরবারে হাজির না থাকিয়া,কোন স্থানে শীকারে নিযুক্ত ছিলেন। বাদসাহ এই অপরাধে, তাঁহাকে জরিমানা করিয়া, তাহা আদায় করিবার জন্য, খাজাঞ্চী সালবৎ খাঁকে পাঠাইয়া দিলেন। অমর সিংহ জরিমানা দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে, তাঁহাকে দরবারে হাজির হইবার জন্য, বাদসাহের আদেশ হইল। অমর সিংহও রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, দরবারে উপস্থিত হইলেন। দরবার গৃহ আমীর ওমরাওয়ে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ ; তিনি তথায় প্রবেশ করিয়াই, একখানা শাণিত ছুরিতে উক্ত সালবৎ খাঁর বক্ষ বিদ্ধ করিয়া, তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। তৎপর বাদসাহের প্রাণ সংহারার্থে তরবারি চালনা করিলে, উহা এক স্তম্ভ গাত্রে বাধিয়া গেল ; এই অবসরে বাদসাহও মধ্য গৃহে পলায়ন করিয়া, মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন। অমর সিংহ সে সময় যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ৫ জন মোগল ওমরাও তৎকর্ত্তৃক হত হইলে পর, অমরসিংহও আপনার শ্যালক অর্জ্জুনগোরের হস্তে নিহত হইলেন। তৎশ্রবণে অমরসিংহের অনুচর বর্গ পীতবাস পরিধানে, লালকিল্লাতে প্রবেশ করিয়া, অনেককে বিনাশ করিল ও পরে ক্রমে ক্রমে সকলেই যুদ্ধ শয্যায় শয়ন করিল। বুন্দী-রাজ কন্যা অমরসিংহের পত্নী। তিনি সে সময় মোগল সম্রাটের অপরিমিত বলবীর্য্যকেও তুচ্ছ করিয়া, স্বামীর মৃতদেহ লইবার জন্য স্বয়ং আসিয়া সেই ভীষণ অভিনয় স্থলে

উপস্থিত হইলেন ও স্বামীর মৃতদেহ গ্রহণান্তর, তদনুগমনে জীবনে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। সেই রাজপুত ললনার অমিত তেজের স্মরণার্থে বোখারা দরওয়াজা ইষ্টকবদ্ধ করিয়া, তাহার নাম "অমর সিংকা ফটক" রাখা হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাস এই দরজা একটী সর্পে রক্ষা করিত। তজ্জন্যই আগ্রাবাসী ইহা খুলিতে সকলকে নিষেধ করিত। কিন্তু নাগরিকগণের এরূপ নিষেধ সত্ত্বেও, ব্রিটিশ-বীর কাপ্তান টিল উহা খুলিতে যাইয়া, সর্পাঘাতে কাপ্তান-লীলা সংবরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। শত্রু হইলেও মুসলমান রাজত্বে হিন্দু ললনার অমানুষী কীর্ত্তির স্মরণচিহ্ন রাখা হইয়াছিল; কিন্তু ঝান্সীর রাণী, আমেদনগরের রাণী প্রভৃতির স্মরণচিহ্ন স্বরূপ ইংরেজ রাজ কিছু রাখিয়াছেন কি?

ইংরেজ রাজত্বের যে সমস্ত দ্রষ্টব্য বিষয় কিল্লাতে আছে, তাহা দেখিবার জন্য আমাদের তত কৌতূহল ছিলনা। কিন্তু বাদসাহী আমলের জিনিষ গুলি দেখিবার জন্যই আমরা বড় লালায়িত হইয়া ছিলাম। আগ্রার কিল্লা একটী দেখিবার [illegible]। কিল্লাতে এখনও বাদসাহী আমলের যাহা [illegible] আছে, তাহা দেখিলেই দর্শকগণ ভারতের পূর্ব্ব [illegible] হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন। কিল্লার মধ্যে [illegible] আম্, দেওয়ান খাস্, জেনানা, মতিমস্জিদ্, নাগিনা [illegible] ও শিশমহল ইত্যাদিই দেখিবার প্রধান বিষয়।

দেওয়ানী আম—এই দরবার গৃহে পূর্ব্বে বাদ-সাহের প্রকাশ্য দরবার হইত। ভারতে ইহাপেক্ষা জাঁকাল দরবার গৃহ আর নাই। ইহা দীর্ঘে ১৮০ ফিট ও প্রশস্তে ৬০ ফিট। এই গৃহের পূর্ব্ব প্রান্তে আকবরের সিংহাসন রাখিবার মঞ্চ। আমাদের প্রদর্শক বলিল—এই মঞ্চের উপর যদি কেহ উপবেশন করিলেই, মুখে রক্ত উঠিয়া, তাহার মৃত্যু হয়। এখন ইহা পরীক্ষা করি কেমন করিয়া? গল্প আছে—একদা একটা অসুর মহাদেবের আরাধনায় ভোলানাথকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট বর লাভ করিল যে, সে যাহার মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিবে সেই তন্মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। পাপাত্মা বরলাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে শিবকেই ভস্ম করিবার জন্য প্রস্তুত। ঠাকুর এখন নিজের বরে নিজে ভস্ম হইয়া যান। তিনি বিপাকে পড়িয়া, দৌড়াইতে দৌড়াইতে বিষ্ণুর যাইয়া শরণ লইলেন। কূটবুদ্ধি বিষ্ণু, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে, অসুর সমীপে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপু, তুমি শিবের পশ্চাতে এরূপ দৌড়াইতেছ কেন?" অসুর আপন দুরভিসন্ধির কথা বলিল। ভগবান বিষ্ণু বলিলেন "বাপু শিব একটা মহা পাগল, তাহার আবার একটা বর। এজন্য এত দৌড়াদৌড়িই বা কেন? নিজের মাথায় হাত দিয়াই ত ইহার পরীক্ষা করিতে পার।" পাপাত্মা বলিল "বাস্তবিকও ত"—এই বলিয়া নিজের মাথায় হাত দিয়া নিজে ভস্মীভূত হইয়া গেল। এখন এ মঞ্চ পরীক্ষা করিতে আমার

ভাগ্যেও যদি সে দশাই ঘটে। অথচ পরীক্ষা করিবার সাধটা খুব প্রবল। মরিবার ভয়ে আমি আর মঞ্চে উঠিতে সাহস পাইলাম না। ভায়াকেই ইহা পরীক্ষা করিতে স্নেহ স্বরে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু আমারনিষ্ঠুর ভায়া প্রাণভয়ে দাদার অনুরোধটী রক্ষা করিলেন না। অমনি ভায়াকে বলিলাম "ভায়া, আর্য্য সন্তান হইয়া, তোমার এত ভয়? ধিক তোমার আর্য্য নামে।" ভায়া বুদ্ধিমান ছেলে, তিনি জবাব্ করিলেন "ঠিক বলেছেন।"

দেওয়ানী আমে এই মঞ্চের সম্মুখ ভাগে এক একটী স্তম্ভের পাদদেশে আমীর, ওমরাও ও দেশীয় রাজন্যবর্গের বসিবার স্থান। পূর্ব্বে দরবার গৃহের উপরিভাগ স্বর্ণ খচিত ছিল; কাল-স্রোতে এখন তাহা এক প্রকার ধুইয়া গিয়াছে। ইংরেজ রাজ তাহার পুনঃ সংস্কার মানসে, কতকটুকু স্থান সংস্কৃত করিয়া, ব্যয় বাহুল্য ভয়ে তদবস্থায়ই রাখিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে এই দেওয়ানী আমে কত কি হইয়া গিয়াছে। এই দেওয়ানী আমেই "সার টমাস রো" প্রভৃতি ইয়োরোপীয়বর্গ দৌত্য কার্য্যে উপস্থিত থাকিয়া, বাদসাহ দর্শনে কৃতার্থ লাভ করিয়া ছিলেন। তখন বিদেশী ইংরেজ এক চক্ষে এ গৃহের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন, এখন সে বিদেশী ইংরেজ অন্যচক্ষেএ গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। পরিবর্ত্তনময়ী প্রকৃতির এইরূপই পরিবর্ত্তন খেলা। আজি যে দাসের ন্যায় কৃপা-ভিকারী, কালি সে প্রাণান্তক প্রভু!!!

দেওয়ান খাস্—বাদসাহের গুপ্ত দরবার। এই গৃহটী দেখিতে পরম সুন্দর। এ স্থানে বসিয়াই আকবর মহারাজা মানসিংহের সহিত যুদ্ধের পরামর্শ করিতেন। এ স্থানেই মহারাজা টোডরমল বাদসাহকে হিসাব পত্র বুঝাইয়া দিতেন। আবার এ গৃহেই দরবার শেষে, হরিদাস গোসাঞির প্রিয় শিষ্য সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন * আপন সুধাবর্ষী সঙ্গীতে আকবরের প্রাণ নাচাইতেন। আজি তাহার সমুদয়ই অতীতের গর্ভে মিশিয়া গিয়াছে!

---

* মিঞা তানসেন ভারতবর্ষের অতি প্রসিদ্ধ গায়ক। মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের প্রসিদ্ধ অনুচর হরিদাস গোসাঞি বৃদ্ধাবস্থায় বৃন্দাবন অবস্থান করিয়া, জীবন অতিবাহিত করিতে ছিলেন। একদা বাদসাহ আকবর দিল্লী হইতে আগ্রা প্রত্যাবর্ত্তন কালে, যমুনা বক্ষ হইতে শুনিতে পাইলেন, বৃন্দাবনের এক সামান্য পর্ণকুটীরে সুমধুর রাধাকৃষ্ণ প্রেম সঙ্গীত গীত হইতেছে। বাদসাহ তৎশ্রবণে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তীরে নৌকা লাগাইয়া, তিনি একজন ভৃত্যকে সঙ্গীতকারীর অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য হরিদাসের অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাকে বাদসাহের সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন। হরিভক্ত হরিদাস তাহাতে অসম্মত হইলে, বাদসাহ আকবর স্বয়ং আসিয়া তাঁহার কুটীরে উপস্থিত। হরিদাসকে তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইয়া, দরবারের গায়ক হইতে অনুরোধ করিলেন। তখন সংসারত্যাগী বৈরাগী উত্তর করিলেন "আমি আগ্রার রাজভবনের সহিতও এ পর্ণকুটীর পরিবর্ত্তন করিতে চাহি না।" বাদসাহ তাঁহাকে কোন মতেই সম্মত করিতে পারিলেন না। কিন্তু আকবরের এরূপ অনুরোধ দেখিয়া, হরিদাস আপন শিষ্য তানসেনকে বাদসাহের

জেনানা—দেওয়ান খাস দেখিয়া, আমরা জেনানা পরিদর্শন করিলাম। এক সময়ে ভারতের রূপ রাশির একত্র সমাবেশ হইয়া এখানে চাঁদের বাজার মিলিয়াছিল। এস্থানেই মোগল-কুলতিলক বাদসাহ আকবর নববার্ষিক নৌরোজা

সহিত পাঠাইয়া দিলেন। তানসেন সম্রাট সভায় গায়ক নিযুক্ত থাকিয়া, ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের অত্যন্ত উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। এই তানসেনই অবশেষে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, মিঞা তানসেন নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। গোয়ালিয়ারে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধি নিকটে একটী তেঁতুল গাছ আছে। এখনও সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা গোয়ালিয়ার উপস্থিত হইয়া, সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শী হইবে বিশ্বাসে, উক্ত বৃক্ষের পাতা খাইয়া থাকে ও তানসেনের সমাধির অত্যন্ত সম্মান করে। তানসেনের মৃত্যু সম্বন্ধেও এক অদ্ভুত কাহিনী কথিত আছে—একদা একজন বিদেশী গায়ক মিঞা তানসেনকে পরাজয় করিবার মানসে, বাদসাহ দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি সঙ্গীতে পরাস্ত হইয়া, তানসেনের বিনাশ সাধনের এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি এক দিন বাদসাহ সমীপে যাইয়া গোপনে বলিলেন, "প্রভো! তানসেন "দীপক" নামে এরূপ এক রাগ গাইতে জানেন যে, তাহাতে আগুণ জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু তিনি সেই রাগ প্রভুকে কখনও শুনান নাই।" ইহা শুনিয়া, বাদসাহ তানসেনকে ডাকাইয়া, সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তানসেন প্রথমে অস্বীকৃত হইলেও পরে বাদসাহের পীড়া পীড়িতে স্বীকার করিলেন যে, তিনি দীপক রাগ গাইতে জানেন। কিন্তু দীপক রাগ গীত হইয়া, অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, মেঘ রাগিনী গাইয়া, বৃষ্টি উৎপাদনে তাহা নির্ব্বাণ করিতে হয়। এখন তানসেন দীপক রাগ গাইলে, কোন গায়ক মেঘ রাগিনীতে তাহা নির্ব্বাণ করিবেন? পূর্ব্বোক্ত ধূর্ত্ত গায়ক তখন স্বয়ং মেঘ রাগিনী গাইবার ভার গ্রহণ

ওরফে খোস্‌রোজা মেলা করিয়া, রমণীর হাট মিলাইতেন। আকবর খোসরোজার দিন এস্থানেই ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া, প্রতাপ-কনিষ্ঠ-শক্তসিংহের দুহিতা ও বিকানীয়ার-রাজ-রায় সিংহের কনিষ্ঠ বীর, কবি ও আকবরের বন্দী পৃথ্বীরাজ-পত্নীর

করিলেন। তানসেনও সে সময় একটা পুকুরের চারি পাড়ে সতৈল বাতি রাখিয়া, গলা জলে নামিয়া দীপক গাইতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে পাখোয়াজওয়ালা পঞ্চমে চড়াইয়া পাখোয়াজ (মৃদঙ্গ) বাজাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সতৈল বাতি গুলি জ্বলিয়া উঠিল। তখন ধূর্ত্ত গায়ক জানিয়াও কতক দূর গাইয়াই আর মেঘ রাগিনী গাইলেন না। তানসেনেরও বুক জ্বলিয়া তিনি মরিয়া গেলেন। "নানি বিবি" ও "সুমানি বিবি" নামে তানসেনের দুই সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা কন্যা গৃহে বসিয়া, পিতার কণ্ঠ নিঃসৃত সুগভীর দীপক গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। অমনি পিতার মৃত্যু আশঙ্কায় তাঁহারা দুই ভগ্নীতে মেঘ রাগিনী গাইতে গাইতে সঙ্গীত স্থলে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের গীতধ্বনিতে ঘনঘটায় মেঘ সাজিয়াছে, কিন্তু বৃষ্টিতে এখন আর কি করিবে? পিতা পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ প্রসিদ্ধ গায়কের মৃত্যু দেখিয়া, বাদক হৃদয়ের দুঃখে দূরে পাখোয়াজ নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে উহা ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড হইয়া গেল। কোন এক অশ্বারূঢ়া গায়িকার হস্ত হইতে পড়িয়া "বীণা"র এক মাথা ভাঙ্গিয়া, সেতার সৃষ্টির ন্যায়, এই ভগ্ন পাখোয়াজেরও দুই খণ্ডের এক খণ্ডে তবল ও অপর খণ্ডেই নাকি বায়ার (ডব্‌গী) সৃষ্টি হইয়াছে। এখনও গায়কগণ তানসেন ও তাঁহার কন্যাগণের সম্মানার্থে গানের পূর্ব্বে "তানা" "নানা" "সুম" এই তিন শব্দে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া, সুর সাধিয়া লন। অনেকে আবার এই গল্প অন্য গায়কের সম্বন্ধেও আরোপ করিয়া থাকে।

অনুপম রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে এক গৃহে ছলে আবদ্ধ করিয়া, প্রেমভিকারী বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ স্থানেই সেই সতীমূর্ত্তি রাজপুত বালিকা আপন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, কটি হইতে চন্দ্রহাস তরবারি খুলিয়া, মধুরে কঠোর, সৌন্দর্য্যে সাহস মাখিয়া, আকবরের প্রাণ সংহারে উদ্যত হইয়াছিলেন। এ স্থানেই দিল্লীশ্বর "আকবর আর কোন দিন কোন রাজপুত রমণীর সতীত্বনাশ করিবেন না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই শক্তিরূপা রাজপুত ললনার নিকট দীনের ন্যায় প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। এ স্থানেই ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় পতিত হইয়া, আকবর আপন নির্ম্মল চরিত্রে একটী কলঙ্ক লেপন করিয়া রাখিলেন। আজি সে জেনানাও সম্পূর্ণ শূন্য, সে সমস্ত রূপ রাশিও দিবসের নক্ষত্র প্রায় অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে।

মতি মসজিদ—বাদসাহ সাজাহান প্রায় ১ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া, বেগমদিগের উপাসনার্থে, ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে পরিষ্কৃত শ্বেত প্রস্তরে এই পরম সুন্দর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা এত সুন্দর যে, হঠাৎ দেখিলে ইহা মতি নির্ম্মিত বলিয়াই অনুমিত হয়।

নগীনা মসজিদ—ইহাও পরম সুন্দর শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। বাদসাহ স্বয়ং উহাতে নেমাজ পড়িয়া, ঈশ্বরোপাসনা করিতেন।

শিশমহল—ইহা বাদসাহ বেগমদিগের স্নানাগার

বলিয়া কথিত। শিশমহলের প্রাচীর গাত্র পরকলা খচিত। সে স্থানে একটী আলো প্রজ্জলিত হইলে, লক্ষ লক্ষ আলো যেন প্রাচীর গাত্রে ঝলশিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নুরজাহানের একখানি মুখারবিন্দ দেখিয়া, জাহাঙ্গীর উন্মত্ত হইয়াছিলেন; মমতাজ বেগমের একখানা মুখ দেখিয়া, সাজাহান এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সমাধি'পরে জগদ্বিখ্যাত তাজমহল পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্নানার্থী হইয়া, অর্দ্ধ বিমুক্ত বেশে, আলুলায়িত কবরীতে যখন সৌন্দর্য্য রূপী যোধবাই, নুরজাহান, মমতাজমহল প্রভৃতি বাদসাহ বেগমগণ আপনাদের অপ্সর-বিনিন্দিত মুখ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় চতুর্দ্দিকে প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিতেন, তখন কি তাঁহারা আপনাদের অপ্সরা-সৌন্দর্য্যে আপনারাই মুগ্ধ হইয়া, আত্মহারা হইতেন না? তখন হয় ত নুরজাহান সম্যক বুঝিতেন, জাহাঙ্গীর কেন এই রত্ন লাভ করিবার জন্য, কতশত অসদুপায় অবলম্বনেও, পূর্ব্ব স্বামী শের আফগানের নিধন সাধন করিয়াছিলেন। তখন যোধবাই বুঝিতেন, হিন্দু ললনার প্রেমে কেন দিল্লীশ্বর আকবর মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন মমতাজ বুঝিতে পারিতেন, তিনিই দিল্লীশ্বরের প্রকৃত ঈশ্বরী। তাঁহার "অজু" "নেমাজ" সকলই তিনি। তাঁহাদের অনুপম রূপ রাশি কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে; কিন্তু শিশমহল তাহার সাক্ষী স্বরূপ আজিও বিরাজমান। আজিও তাহার প্রাচীর গাত্র সে সমস্ত পরকলায় বিভাসিত, কিন্তু তৎপ্রতি-

কলিত সেই মুখছবি গুলি নিদ্রার স্বপ্নের ন্যায় কোথায় নিবিয়া গেল ?

আমরা কিল্লার এ সমস্ত দ্রষ্টব্য বিষয় পরিদর্শন করিয়া; দেওয়ানী আমের এক প্রান্তে, সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সোমনাথের চন্দন কবাট দেখিতে পাইলাম। কবাটটী উচ্চে ১১ ফিট, প্রশস্তে ৯ ফিট—ইংরেজ-রাজ কর্ত্তৃক জয়চিহ্ন-স্বরূপ, গজনি হইতে ভারতে পুনরানীত হইয়াছে। দেওয়ানী আমের সম্মুখেই উত্তর পশ্চিম বিভাগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর "কলভিন" সাহেবের সমাধি।

আমরা কিল্লা পরিদর্শন করিয়া, সন্ধ্যার সময় ব্যথিত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, আর রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া, ভারত ইতিহাসের সে পূর্ব্বকথা গুলি ভাবিলাম।

২৫শে আগষ্ট—আমরা "রামবাগ" ও ইতামুদ্দৌল্লা দেখিতে যাত্রা করিলাম। রামবাগ ও ইতামুদ্দৌল্লা উভয়ই যমুনার অপরপাড়ে অবস্থিত। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, আমরা যমুনার সেতু পার হইলাম; তৎপর উত্তরাভিমুখী হইয়া, রামবাগের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। তথাকার একজন লোক আমাদিগকে রামবাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনা বলিয়াছিল। "সাজাহান বাদসাহের কোন এক প্রিয় কুমারী পিতাকে একটী প্রমোদ উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। বাদসাহও যমুনার তীরে কন্যার মনোরঞ্জনার্থে, এই উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কালে ইহার খুব শোভা

সমৃদ্ধি ছিল, ইহাতে দেখিবার অনেক বিষয় ছিল, কিন্তু আজি ইহা একটী সামান্য উদ্যান মাত্র। ভরতপুরের রাম সিংহ নামক জনৈক মহারাজ আগ্রা লুণ্ঠন করিয়া, আপন নামানুসারে ইহার "রামবাগ" নামকরণ করিয়াছিলেন।" আবার অনেকে বলেন "আরাম বাগ" (বিশ্রাম উদ্যান) নাম হইতেই ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। যমুনায় স্নান করিবার জন্য. রামবাগে মৃত্তিকাতলবাহী একটী পথ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আমরা রামবাগ পরিদর্শনান্তর, ফিরিয়া আসার কালীন "ইতামুদ্দৌল্লা" পরিদর্শন করিলাম। ইতামুদ্দৌল্লা তাজমহলের জ্যেষ্ঠতাত ও নুরজাহানের ভ্রাতা। এক সময় তিনি বাদসাহের উজীর ছিলেন। ইহা দেখিতে পরম সুন্দর। ইহারও প্রাচীর গাত্র তাজমহলের ন্যায়. কোরাণের শ্লোকে ও বিবিধ বর্ণের প্রস্তরে চারু খচিত। ইতামুদ্দৌল্লার মধ্যভাগে, ইতামুদ্দৌল্লা, উজীর বেগ (অন্য নাম খাজা আয়াস—ইতামুদ্দৌল্লার পিতা) জাহানী (ইতামুদ্দৌল্লার মাতা) আজফ খাঁ (ইতামুদ্দৌল্লার ভ্রাতা) ফইমান্ (ইতামুদ্দৌল্লার কন্যা) ও তাঁহার ভৃত্য নাছিরের সমাধি মঞ্চ বিরাজমান রহিয়াছে। আমরা রাম বাগ ও ইতামুদ্দৌল্লা পরিদর্শন করিয়া, সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

২৭শে আগষ্ট—প্রাতে আমরা আগ্রার কলেজ, সেনানিবাস (Cantonment) ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিলাম।

তৎপর আহারান্তে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া "সেকেন্দ্রা" দর্শনে যাত্রা করিলাম। সেকেন্দ্রা আগ্রা সহর হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ সেকেন্দার লোডীর নাম হইতেই এস্থানের নাম সেকেন্দ্রা হইয়াছে। বেলা ১২টার সময় আমরা সেকেন্দ্রা যাইয়া পৌঁছিলাম। সেকেন্দ্রার পশ্চিম প্রান্তে এক তোরণ অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণ সম্মুখেই একটী হর্ম্ম্যোপরি চারিটী স্তম্ভ (Monument)। তাহার একটী এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একজন বিবি নাকি এই স্তম্ভোপরি উঠিয়া তাহার অগ্রভাগ সহ পড়িয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি এখন আর কাহাকেও স্তম্ভোপরি উঠিতে দেওয়া হয় না। সেকান্দ্রাতেই মোগল কুলতিলক বাদসাহ আকবরের সমাধি। সেকেন্দ্রা একটী দ্বিতল গৃহ, মসজিদের আকারে বিনির্ম্মিত। উপরের গুম্বজের অবয়ব দৃষ্টে, ইহাকে চারিতল মসজিদ নামেও অভিহিত করা যায়। আকবর রাজত্বের চতুর্দ্দশ সুবার চিহ্ন স্বরূপ, মসজিদোপরি চতুর্দ্দশটী চূড়া নির্ম্মিত। আমরা জুতা ছাড়িয়া, সর্ব্ব প্রথমে উপরের গৃহটী পরিদর্শন করিলাম। উপরের গৃহে আকবরের কৃত্রিম সমাধি মঞ্চ। মেজটী নানাবিধ চিত্র বিচিত্র প্রস্তরে মণ্ডিত; দেখিলে বোধ হয় যেন, প্রস্তর গুলি নানাবিধ রঙ্গে চিত্রিত করিয়া, সাজান হইয়াছে। বাস্তবিক এই সমস্ত প্রস্তর মনুষ্য চিত্রিত নয়। প্রকৃতিই প্রস্তরগুলিকে এরূপ চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন। জয়পুরাধিপতি মহারাজা

মানসিংহ আপনার কুলীন পিসামহাশয় আকবরের সম্মানার্থে, এ সমস্ত প্রস্তর দান করিয়াছিলেন। আমরা সেকেন্দ্রার দ্বিতল গৃহ পরিদর্শন করিয়া, আকবরের প্রকৃত সমাধি মঞ্চ দেখিবার জন্য নিম্নে অবতরণ করিলাম। একজন মুসলমান একটী আলো জ্বালাইয়া, আমাদিগকে আকবরের সমাধি দেখাইতে লইয়া চলিল। আমরাও তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়া, একটী অন্ধকার পূর্ণ স্থানে প্রবেশ করিয়া, আকবরের সমাধি মঞ্চ পরিদর্শন করিলাম। সমাধি মঞ্চের উপরিভাগে একখানা কোরাণ রক্ষিত! স্থানটী যে ক্রমশঃই নিম্ন হইয়া যাইতেছে, সমাধি স্থান দেখিলেই তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। হায়! যে আকবর আপন সৌজন্য বলে, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; যে আকবরকে লোকে রাম রাজা বলিয়া অভিহিত করে; দিল্লীশ্বর মোগল কুলতিলক সে আকবর আজি এ নীরব অন্ধকার পূর্ণ স্থানে চির নিদ্রায় নিদ্রিত; ঐশ্বর্য্যের জাঁক জমক আর তাঁহার মনে এখন সুখ শান্তি ঢালিতেছে না; হিন্দু মুসলমানের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি আর এখন সচেষ্ট নন—সংসারে একা আসিয়াছিলেন, আজিও তিনি এই নির্জ্জন গভীর অন্ধকারময় স্থানে একা শুইয়া আছেন। মনুষ্য অদৃষ্টের এই ত পরিণাম! তবুও ভ্রান্ত জীব মনুষ্য দেহের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা মনে করিয়া, সংসার-আশক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না।

মসজিদের বারেন্দায় আকবরের দুইটী পৌত্র সমাধিস্থ—স্বর্গরাজ্যেও স্নেহশীল পিতামহের স্নেহ উপভোগ করিবার জন্যই যেন, তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন। সেকেন্দ্রার উদ্যান মাঝে আমীর ওমরাওগণ সমাধিস্থ থাকিয়া, মৃত্যুর পরও যেন; তাঁহাদের প্রচুর প্রভুভক্তির পরিচয় দিতেছেন।

সেকেন্দ্রা মসজিদের সন্নিকটেই মনিবেগমের সমাধি। মনিবেগম ইয়োরোপীয় পর্ত্তুগীজ মহিলা। গোয়ার পর্ত্তুগীজ যাজকগণ দিল্লীশ্বর আকবরের মনস্তুষ্টির জন্য, তাঁহাকে এই ইয়োরোপীয়-সুন্দরী উপহার দিয়াছিলেন।

যোধপুরেশ্বর মালদেবের কন্যা আকবরের হিন্দু মহিলা যোধবাই ও এস্থানে স্বীয় মুসলমান স্বামীর সন্নিকটে সমাধিস্থ। অনেকে এই যোধবাইকে জাহাঙ্গীর-পত্নী ও খস্রু-মাতা যোধবাই উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। জাহাঙ্গীর-পত্নী যোধবাই অম্বররাজ মানসিংহের ভগ্নী। তিনি স্বামীর জীবিতাবস্থায়ই, বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া,আলাহাবাদের খস্রু বাগ নামক উদ্যানে স্বীয় তনয় খস্রু ও পারবেজের সমাধি-মধ্যস্থলে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। মালদেব দুহিতা যোধবাই ভিন্ন, আকবর অম্বররাজ-ভরমলের দুহিতারই প্রথম পাণিগ্রহণ করেন।

আমরা সেকেন্দ্রা পরিদর্শন করিয়া অপরাহ্ণে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। বে—বাবু আমাদিগকে "ফতেপুর সিক্রি" দেখিবার জন্য কতবার অনুরোধ করিলেন। ফতেপুর

সিক্রি আগ্রা হইতে ১২ ক্রোশ দূরে বলিয়া, সে সময় আমরা সে স্থান দেখিতে নিরস্ত রহিলাম। ফতেপুর সিক্রিতে বাদসাহী আমলের দেখিবার অনেক বিষয় আছে।

অযোধ্যার ন্যায় আগ্রাতেও বানর বৃন্দের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডারুইনের (Darwin) অভিব্যক্তিবাদী মত সমর্থন করিতে, আগ্রার একটী বানর নাকি, একদিন একটা মানবীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, বানর-লীলা সমাপ্ত করিয়াছিল। পাঠক মহাশয়দিগকে আমরা তাহা উপহার প্রদান না করিয়া, থাকিতে পারিলাম না। "আগ্রার কোন একটী ভদ্রলোক নাপিতকে ঠকাইবার ইচ্ছায়, প্রতিদিন একখানা আয়না সম্মুখে রাখিয়া, নিজেই নিজকে ক্ষৌরী করিতেন। এক বানর মহাশয়ও তাঁহাকে ঠকাইবার মানসে, অদূরে বসিয়া প্রতিদিন মনোযোগের সহিত এই দৃশ্য দেখিত। আগ্রার বানর দিগের স্বভাব, গৃহের দ্বার খোলা পাইলে এক গৃহস্থের দ্রব্যজাত অপহরণ করিয়া, অন্য গৃহস্থের বাড়ীতে, অথবা অন্যত্র ফেলিয়া দেয়। তাহাদের এইরূপ অমানুষী অনুগ্রহে, সচরাচরই কোন গৃহস্থের "সর্ব্বনাশ" ও কোন গৃহস্থের "পৌষ মাস" উপস্থিত হইয়া থাকে। একদিন ভদ্র লোকটী ক্ষৌর কর্ম্ম করিয়া, গৃহ দ্বার খোলা রাখিয়া, কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। বানর মহাশয় বাহিরে বসিয়া, এই ক্ষৌর ক্রিয়া দেখিতে ছিল। ভদ্রলোক

চলিয়া যাওয়া মাত্রই গৃহে যাইয়া প্রবেশ করিল। ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী নাই দেখিয়া, বানর মহাশয় আয়না ও ক্ষুর অপহরণ করিয়া, এক গৃহ প্রান্তে যাইয়া, ক্ষৌর-কারী ভদ্রলোক সাজিয়া বসিল। আয়না খানা সম্মুখে রাখিয়া, গম্ভীর মূর্ত্তিতে একবার ক্ষুর খানাকে ধারাইয়া লইল। পরে দাড়ি কামাইবার মানসে, তাহা গলদেশে লাগাইয়া, ক্ষৌর-কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। খুব শিক্ষিত কি না—প্রথম অস্ত্রচালনায়ই তাহার গলদেশ কাটিয়া গেল। কর্ত্তাটীও রক্তাক্ত গ্রীবায় ছাদ হইতে পড়িয়া যাইয়া, পঞ্চম মাত্রায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বানরদিগের এই মানবীয় কার্য্য কলাপ মনে করিলে, ডারুইন যে, মানব বংশোৎপত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ও সন্দেহ অনেকটা দূর হইয়া যায়।

বে—বাবুর অনুরোধে আমরা আগ্রাতে আরো কতক দিন অবস্থান করিয়া, অবশেষে রাজপুতানা যাত্রা স্থির করিলাম। বে—বাবু এত সহৃদয়, এত স্নেহ শীল যে, আমরা আগ্রা ত্যাগ করিব শুনিয়া, তিনি বড় দুঃখিত হইলেন। ২রা সেপ্টেম্বর বে—বাবুকে তাঁহার সৌজন্যের জন্য, সহৃদয়তার জন্য, আমাদের প্রতি তাঁহার নিস্বার্থ স্নেহের জন্য, রাশি রাশি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, আমরা সন্ধ্যার সময় ষ্টেষণে চলিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার সময় রাজপুতানা এও মালোয়া ষ্টেট রেলওয়ের গাড়ী ছাড়িবে। বে—বাবুও আমাদের সঙ্গে ষ্টেষণে আসিয়াছেন। তাঁহাকে

বড় দুঃখিত করিয়া, সন্ধ্যার সময় আমরা ভরতপুর উদ্দেশে রাজপুতানা রওনা হইলাম। গাড়ী ষ্টেষণ ছাড়িয়া চলিল। রাজপুতানা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। ইতিহাসে ও ভূগোলে তাহার নাম শুনিয়াছি মাত্র, কিন্তু সে সময় রাজপুতানা সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। সে দেশের ভাষা হিন্দি না অন্য কিছু, দেশীয় লোকের আচার, ব্যবহার কিরূপ, রাজপুতানার প্রাকৃতিক দৃশ্য কিরূপ, তাহা কিছুই জানিতাম না। তখন ভাবিয়াছিলাম, রাজপুতানা এখনও বীরভূমি, এখনও রাজপুতানাবাসী অমিত তেজ রাজপুতের ন্যায়ই প্রতাপশালী, এখনও রাজপুতানা ভারত-বীর্য্যের গৌরব-ক্ষেত্র। গাড়ীতে বসিয়া ভায়াতে আমাতে এ সমস্ত বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলাম। গাড়ী রাজপুতানা প্রবেশ করিয়াই, আমাদিগকে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। তখন রাত্রি বলিয়া, পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম না। "ভেতো" বাঙ্গালীর অদৃষ্টে রাজপুতানায় কি আছে, ভায়াতে আমাতে তখন কেবল ইহাই ভাবিতেছিলাম।

অষ্টম অধ্যায়।

ভরতপুর।

রাত্রি ১১৷৷০টার সময় আমাদের গাড়ী আসিয়া, ভরতপুরে উপস্থিত। আমরা ভরতপুর পর্য্যন্ত টিকেট করিয়াছিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়াই কোন সরাই উদ্দেশে চলিলাম। ষ্টেষণের অনতি দূরে একটী বড় রকমের সরাই। তথায় যাইয়া, একখানা ঘর ও খাটীয়া ভাড়া করিলাম; পরে উদর দেবের পুনঃ সন্তোষার্থে যত্নপর হইলাম। কথাবার্ত্তায় প্রায় ১ ঘণ্টা চলিয়া গেলে পর, ভরতপুর মহারাজের এক জন কর্ম্মচারী আসিয়া, আমাদের নাম, ধাম, বৈষয়িক অবস্থা, আমাদের সঙ্গে কোন প্রকার অস্ত্র, শস্ত্র আছে কিনা, বেচিবার উপযুক্ত কোন জিনিষ আছে কিনা, ইত্যাদি নানা প্রকার বিষয় লিখিয়া লইলেন। আমাদের নাম লিখিতেই কর্ম্মচারী ভায়ার গলদ্ ঘর্ম্ম—তাঁহার কোন পুরুষেও কেহ কখন এরূপ নাম শুনিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমাদের নাম লেখা লইয়া, তিনি যেরূপ শঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, ও আমাদিগকে যেরূপ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া, বিরক্ত করিতেছিলেন, তাহাতে একবার মনে লইয়াছিল যে, আমাদের প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে "রাম সিং" কি "কিষণলাল" একটা সেদেশী নাম বলিয়া, নিষ্কৃতি

পাই। কিন্তু আগে বলিয়া ঠকিয়াছি, তখন আর কি করি, কর্ম্মচারী ভায়াকে উর্দ্দু বর্ণ বিন্যাসে আমাদের নাম ধাম বলিয়া দিয়া, এ মহা বিপদ হইতে তিনি ও আমরা উভয়েই মুক্ত হইলাম। তাঁহারো যেন ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। তিনি নিষ্কৃতি পাইয়া, আমাদিগকে একটা সেলাম বাজাইয়া প্রস্থান করিলেন। আমরা কিঞ্চিৎ লুচি যোগ করিয়া, সরাইতে রাত্রিটী অতিবাহিত করিলাম। পাঠকবর্গ শুনিবেন কি? এস্থানে পাঁচ পয়সা মূল্যে বিশুদ্ধ ঘিয়ে ভাজা লুচি বিক্রী হয়। এখন আমরা ক্রমশঃ পশ্চিমে অগ্রসর হইতেছি, লুচির মূল্য ও ক্রমশঃই কমিতেছে। পরিবর্ত্তন শীল সংসারে লুচির অদৃষ্টে এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া, আশ্বস্ত চিত্তে ভায়াকে বলিলাম; "ভায়া হে! অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, আরো পশ্চিমে অগ্রসর হইলে বোধ হয়, বিনা পয়সায় লুচি খরিদ করিতে পারা যাইবে" শুনিয়া ভায়া একটুকু হাসিলেন।

৩রা সেপ্টেম্বর অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃ-কৃত্য সম্পন্ন করিলাম। পরে একখানা এক্কা গাড়ী ভাড়া করিয়া, ইতিহাস বর্ণিত ভরতপুরের সে অজেয় দুর্গ পরিদর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। এক্কা আমাদিগকে ক্ষণেক আসন হইতে দুই চারি অঙ্গুলী উপরে তুলিয়া, ক্ষণেক আবার আসনে পাতিত করিয়া, সর্ব্ব শরীরে ব্যায়ামের নানাপ্রকার আস্বাদন উপভোগ করাইয়া, আমাদিগকে লইয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

ক্ষণেক মন্দগতিতে, ক্ষণেক দ্রুতগতিতে তাঁহার দেহে ও অস্মদীয় দেহের কলিসণ (সংঘর্ষণ) উৎপাদন করিয়া, আমাদিগকে "পৃষ্ঠালিঙ্গনের" যথেষ্ট সুখ উপভোগ করাইতেছে। তাঁহার সোমত্ত বয়স। তাঁহার ইহাতে ভ্রুক্ষেপও নাই, তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া এক্কার গতির সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। দাদার কিন্তু ইহাতে প্রাণান্ত! রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ, তাহাতে অসংখ্য ময়ূর ময়ূরী, কেহ পেকম ধরিয়া, কেহ পেকম বুজাইয়া বসিয়া আছে। এক্কায় বসিয়াই আমরা তাহা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। আমরা কতক দূর যাইয়াই, একটী নহর (খাল) অতিক্রম করিলাম। তৎপর ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইয়া, আর একটী নহর পার হইলাম। এ নহরের পরই একটী মৃত্তিকা প্রাচীর (Earthen wall)। মৃত্তিকা প্রাচীরের পর বিস্তীর্ণ দুর্গ পরিখা (Ditch)। দুর্গ পরিখার পর আবার প্রস্তর নির্ম্মিত দৃঢ় উচ্চ প্রাচীর। তখন বর্ষাকাল। দুর্গ পরিখা জলে পূর্ণ হইয়া, একটী বিস্তীর্ণ খালের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। দেখিলাম রাশি রাশি প্রকাণ্ড কচ্ছপ তাহাতে ভাসিয়া ভাসিয়া, জলকেলী করিতেছে। তাহাদের এরূপ জনতা দেখিয়া, আগ্রার যমুনা-জল-বিহারী কচ্ছপ সমূহের কথা মনে পড়িল। দুর্গের প্রস্তর প্রাচীর বড় বড় প্রস্তর খণ্ডে নির্ম্মিত। কিন্তু মৃত্তিকা প্রাচীরই যুদ্ধের সময় অধিক দুর্ভেদ্য বলিয়া বোধ হইল। দুর্গ পরিখার উপরিভাগে একটী সেতু—সেতুর পর প্রকাণ্ড দুর্গ দ্বার (Gate)। আমরা দুর্গ দ্বার অতিক্রম করিয়া

দুর্গে প্রবেশ করিলাম। তাহার পর যাহা দেখিলাম,তাহাতে যেন, হৃদয়ে শ্মশান জ্বলিয়া উঠিল।

ভরতপুরের মহারাজা ইংরেজ রাজকে আপন রাজ্যে অন্যায়-হস্তক্ষেপ করিতে না দেওয়াতে, ভরতপুর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ১৮২৭ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে লর্ড কম্বারমিয়র (Combermere) এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া, সম্পূর্ণ অকৃত-কার্য্য হইলেন। তাহাতে ভরতপুর দুর্গ অজেয় বলিয়া বিশ্বাস হওয়াতে, পশ্চিম ভারতে ইংরেজ-রাজের রাজনীতি গগন একটুকু ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ব্রিটন দ্বীপের প্রতি বিধাতা সুপ্রসন্ন। ভারতে কোন রাজাই প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করিবেন না। অবশেষে যে ভরত-পুর দুর্গের নিকট ব্রিটিষ সিংহের অপরিমিত বলবীর্য্য সাত-বার পরাস্ত মানিয়াছে,যে দুর্গের বলবীর্য্য দেখিয়া,ব্রিটিষসিংহ ভরতপুর জয়ে নিরাশ হইয়াছিলেন, যে দুর্গের নিকট ১৮০৫ খৃঃ অব্দে লর্ড লেক (Lord Lake) একবার পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া-ছিলেন; যে দুর্গ ইয়োরোপীয় সেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়, পরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেশীয় সিপাহী বীর্য্যে অধিকৃত হইয়া-ছিল ও ব্রিটনের কপালে বিজয় তিলক পরাইয়া দিয়াছিল, আজি সে ভরতপুর দুর্গের এই ভগ্নাবস্থা! এই শোচনীয় দশা!! আজি, যাহা সৌভাগ্য শিখরে স্থাপিত, নিয়তির অত্যাচারে, কালি তাহা দুর্ভাগ্যের অতল গুহায় নিহিত!

দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক লোক বাস করে। রাজপ্রাসাদ

ভিন্ন অন্যান্য হর্ম্ম্যরাজী প্রায়ই নিতান্ত শোচনীয় অবস্থাপন্ন। মধ্যভাগে দুর্গ প্রাচীর সংলগ্ন রাশি রাশি মৃত্তিকা স্তূপ রহিয়াছে। দুই একটী স্তূপের উচ্চতা এত অধিক যে, বাহির হইতে তাহা অনায়াসে দৃষ্ট হয়। শত্রু আক্রমণের সুবিধার্থেই পূর্ব্বে এ সমস্ত স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথাকার একজন লোক আমাদিগকে বলিল যে, পূর্ব্বে ভরতপুর দুর্গের চতুর্দ্দিকে সাতটী নহর (খাল) ছিল, এখন তাহার অধিকাংশই মৃত্তিকায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুর্গ পরিখা, মৃত্তিকা প্রাচীরের বাহ্য পরিখা ও অন্য একটী নহর ভিন্ন, অন্যান্য নহর গুলি নির্দ্দেশ করা এখন নিতান্ত সুকঠিন। এক একটী নহর অতিক্রম করিতেই শত্রুকে নিতান্ত কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। এরূপ সাতটী নহর অতিক্রম করিয়া, দুর্গ আক্রমণ করা নিতান্ত কষ্ট সাধ্য বলিয়া, পূর্ব্বে ভরতপুর দুর্গ দুর্ভেদ্য ও অজেয় নামে অভিহিত ছিল। আমরা দুর্গ মধ্য পরিদর্শন করিলাম, অনা' তোরণ অতিক্রম করিয়া, বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া, আবার এক্কা যোগে রাজপ্রাসাদ দর্শন করিতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলাম।

দুর্গ হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে রাজপ্রাসাদ (Palace) অবস্থিত। আমরা রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া, বিশ্রামার্থে একটী পুষ্করিণীর তটে অবস্থান করিলাম। তাহার নিকটেই জাটগণ (ভরতপুরবাসীদিগকে জাট বলে, ইহারা জাতিতে সদ্গোপ) একের পর অন্যে ব্যায়াম করিতেছে,

আর ঘটি ঘটি সিদ্ধি উদরসাৎ করিতেছে। দেখিয়া আমরা অবাক! শারীরিক বল বিধানার্থে, আমরা ভরতপুরবাসী-দিগের বিশেষ যত্ন দেখিলাম। ভরতপুরের বর্ত্তমান অধীশ্বর মহারাজা যশোবন্ত সিংহ বাহাদুর ও আপন সেনা মণ্ডলীকে মল্ল ও যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতে নিয়ত উদ্যোগী। এমন কি, ভয়ানক গ্রীষ্মের সময়ও তিনি মাঠের চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালাইয়া, সৈন্যদিগকে তন্মধ্যে কাওয়াজ (Parade) শিক্ষা দিয়া থাকেন। এ জন্যই প্রিন্সেপ নামক জনৈক বিলিতী চিত্রকর, (যিনি মহারাণী ভারতেশ্বরীর Empress of India উপাধি গ্রহণের সময়, দেশীয় রাজাদিগের চিত্র গ্রহণের জন্য দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন) ভরতপুরের মহারাজাকেও স্বর্গীয় সিন্ধিয়া মহারাজের ন্যায় সেনা বর্দ্ধনেচ্ছু (Fond of soldiering) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ভরতপুর রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের শেষ ভাগে সংস্থা-পিত। চোরমান নামক একজন জাট সর্দ্দার এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট ফিরোক শিয়ারের রাজত্বকালে, মোগল পতনের সূত্র পাত হইলে, যোদ্ধজাতি জাটগণ আপনাদিগের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া, এক পরাক্রান্ত জাতি হইয়া উঠিল। জয়পুরেশ্বর দ্বিতীয় জয় সিংহ বাহাদুর সেই সময় জাট-দিগকে পরাস্ত করিয়া, স্বপক্ষীয় বদন সিংহ নামক জনৈক যোদ্ধাকে ভরতপুরের ভিন্ন রাজা রূপে সংস্থাপন করিয়া, বর্ত্তমান ভরতপুর রাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। রাজত্বের

সূত্রপাত হইতেই এরাজ বংশ বল বীর্য্যে নিতান্ত প্রসিদ্ধ। এমন কি, এক সময়ে জাটগণ আপন শৌর্য্যবীর্য্যে মোগল রাজধানী আগ্রা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থান সমূহেরও নিতান্ত ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

আহারের সময় উপস্থিত হইলে, আমরা বাজারে যাইয়া, লুচি ইত্যাদি দ্বারা আহার করিলাম। এখন আর লুচি দেখিলে হাইড্রফোবিয়া (Hydrophobia) রোগীর জলভীতির ন্যায়, ভীতি উপস্থিত হয় না। লুচির সহিত ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। কম্পিটিসনে (Competetion) ভায়াও এখন নেহাত ছাড়াইয়া যাইতে পারেন না। এখন ভায়াতে আমাতে প্রায়ই লুচি যুদ্ধের কম্পিটিসন হইয়া থাকে।

আমরা ভরতপুরের অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিলাম। রাজ প্রাসাদটী সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মহারাজ সে সময় ভরতপুরে ছিলেন না। তিনি ভরতপুর রাজধানী হইতে প্রায় ২২ ক্রোশ দূরে "দিক্" নামক রাজ ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। আগ্রা লুণ্ঠনাপহৃত দ্রব্য জাত দ্বারা "দিক্ ভবন" নির্ম্মিত। সেখানে নাকি দেখিবার অনেক জিনিষ আছে। মহারাজের সাক্ষাৎ লাভার্থে আমরা "দিক্" যাওয়াই স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু উষ্ট্র অথবা উপযুক্ত বাহন না পাওয়াতেই, আমরা আমাদের সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। কাযেই বিকাল বেলা আবার পূর্ব্ব সরাইতে ফিরিয়া আসিলাম।

—:০:—

নবম অধ্যায়।

জয়পুর।

৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ১২ টার পর, আমরা গাড়ী চাপিয়া, জয়পুর রওনা হইলাম। পূর্ব্বে জয়পুর সম্বন্ধে কত কথা শুনিয়াছি। সে স্থান পরিদর্শন করিবার জন্য আমাদের কৌতূহল নিতান্ত বাড়িয়াছিল। গাড়ী কখন জয়পুর পৌছিবে, সে সময় বসিয়া বসিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেছিলাম। রাত্রি কাল বলিয়া গাড়ীতে বসিয়া, পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিদর্শন করিতে পারিলাম না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে রাত্রিও পোহাইয়া গেল। আমরা অতি প্রত্যূষে পর্ব্বত সঙ্কুল রাজপুতানার দৃশ্য বড় নূতন দেখিতে পাইলাম। চারিদিকই প্রস্তরময়—ধূসর বর্ণের পাহাড় ইতস্ততঃ বন্ধুর ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীতে বসিয়া, এ সমস্ত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, আমরা বেলা ৭॥ টার পর আসিয়া, জয়পুর ষ্টেষণে পৌছিলাম। জয়পুর ষ্টেষণটী সহরের বাহিরে অবস্থিত। আমরা এক খানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, আমাদিগকে কোন বাঙ্গালী বাবুর বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য গাড়োয়ানকে অনুমতি করিলাম। জয়পুর উচ্চ প্রাচীরে দুর্গবদ্ধ (Fortified.) সহর। কতক্ষণ পরে গাড়ী এক তোরণ নিকটে উপস্থিত হইলে, দ্বার-

রক্ষক, বিক্রয়োপযুক্ত কোন দ্রব্য জাত কি অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে আছে কি না, দেখিবার জন্য আমাদের দ্রব্যজাত পরিদর্শন করিল। তৎপর বিনা আপত্তিতে আমাদিগকে সহরে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিল। সহরের রাস্তাগুলি প্রস্তর মণ্ডিত। রাস্তা বাহিয়া যাইতে যাইতে, আমরা দুপার্শ্বের শোভা দেখিতে লাগিলাম। বড় রাস্তার পার্শ্বে গৃহগুলি এমন সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়াই জয়-পুরের সৌন্দর্য্য আমরা অনেকটা অনুভব করিতে পারিলাম। রাস্তা বাহিয়া যাইবার সময় দেখিলাম যে, আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বের গৃহ খানা যেরূপ রঙ্গে চিত্রিত ও যেরূপ গঠনে গঠিত, বাম পার্শ্বের গৃহ খানাও ঠিক সেরূপ রঙ্গে চিত্রিত ও সেরূপ গঠনে গঠিত। জয়পুর গভর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারেই গৃহস্বামীদিগকে এরূপ নিয়মে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। ছোট রাস্তায় প্রায়ই এরূপ নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। আমরা রাস্তার পার্শ্বস্থ এ সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, এক বাঙ্গালী বাবুর বাসাতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরি,—ভ্রমণকারী ও বাঙ্গালী অভ্যাগত-দিগের নিকট তাঁহার গৃহ দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। জয়পুর অনেক উচ্চ বেতন ভোগী বাঙ্গালী বাবু আছেন বটে, কিন্তু প্রাইভেট সেক্রেটরি বাবুই অতিথি সৎকারের জন্য জয়পুরে নিতান্ত প্রসিদ্ধ। আমরা যে কতক দিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলাম, তাহাতেই স—বাবু ও তাঁহার পরিজনবর্গের

সদাশয়তা দেখিয়া, নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমরা স—বাবুর আবাসে অবস্থান করিয়া, আহারাদি সম্পন্ন করিলাম। পরে বিকাল বেলা পদব্রজে বাহির হইয়া, প্রথমতঃ জয়পুর ইংরেজী কলেজ, সংস্কৃত কলেজ ও পরে আর্ট স্কুল ও মনিউমেণ্ট (Monument) পরিদর্শন করিলাম। জয়পুর আর্টস্কুল পরিদর্শন করিয়া, আমাদের স্থির বিশ্বাস হইল যে, এক চিত্র ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে উহা কলিকাতার আর্ট স্কুল হইতে উৎকৃষ্ট। জয়পুর কলেজ ও আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল দুজন বাঙ্গালী বাবু। তাঁহারা উভয়েই আমাদিগকে সাদরভাবে, উভয় বিদ্যালয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করাইয়া আপ্যায়িত করিলেন। আর্টস্কুলে ঘড়ি (Timepiece) প্লেইট ইত্যাদির নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া, আমরা বড় সুখী হইয়াছিলাম। তখন মনে লইতেছিল, পরাধীন ভারতের সর্ব্বত্র এরূপ শিল্পের আদর হইলে এ হতভাগ্য দেশের দিন আবার ফিরিবে। একজন জন্মান্ধ কর্ত্তৃক একটী হস্তী দন্তের বল (Ball) এরূপ ভাবে নির্ম্মিত দেখিলাম যে, তাহা দেখিয়া আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। উক্ত দিবস আর্ট স্কুল ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়াই, আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

৬ই সেপ্টেম্বর আহারান্তে আমরা রাজভবনে যাইয়া, "সর্ব্বত্র মঙ্গল" (দরবার গৃহ) "হাওয়া মহল", "মৃগশালা" ও "চন্দ্রমহল" ইত্যাদি পরিদর্শন করিলাম। রাজ ভবনের যত দূর দেখিতে পারিলাম, তাহা দেখিয়াই আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া-

ছিলাম। মহারাজার নাট্য গৃহটী (Theatre house) একটী দেখিবার বিষয়। কলিকাতার কোন নাট্যশালাই দেখিতে তদ্রূপ নয়। স্বর্গীয় মহারাজা সেওয়াই রামসিংহ বাহাদুর প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া, ইতালী দেশীয় কারিকর দ্বারা এ নাট্যশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। কাশীর মানমন্দিরের ন্যায় জয়পুরে হাওয়া মহলের নিকটে একটি জ্যোতিষ-মন্দির আছে। ইহাও কাশীর মান মন্দিরের ন্যায় এখন নিতান্ত অব্যবহার্য্য। এই সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া, আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। রাজভবনের অন্দর মহলেও শোভা-নিবাস, মৌজ-মন্দির, সুখ নিবাস ও মুক্তা মন্দির নামে অসংখ্য দর্শনীয় গৃহ আছে। কিন্তু তাহা অন্যের দেখিবার অধিকার নাই।

৭ই সেপ্টেম্বর সকাল বেলা আমরা জয়পুরের বাজার ইত্যাদি পরিদর্শন করিলাম। অপরাহ্নে আহারান্তে সহর হইতে বাহির হইয়া, "রেসিডেন্সী" ও "রাম নিবাস বাগান" পরিদর্শন করিলাম। রাম নিবাস বাগান আমাদের ইডেন গার্ডন ইত্যাদি হইতে ও দেখিতে সুন্দর ও মনোহর। মহারাজা রামসিংহ বাহাদুর আপন নামানুসারে এই বাগানের "রাম নিবাস বাগ" নাম রাখিয়াছেন। বাগানের কিঞ্চিৎ উত্তর পশ্চিমে ভারত-রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেওর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্ব ভাগে প্রাণী বিভাগ (Zoological part) নানাবিধ প্রাণীতে পরিপূর্ণ। বাগান হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আমরা বিকাল বেলা মিউজিয়াম পরি-

দর্শন করিলাম। মিউজিয়ম কলিকাতার মিউজিয়মের ন্যায় ততদূর সমৃদ্ধিশালী না হইলেও, উহাতে দেখিবার অনেক বিষয় আছে। জয়পুরের কারুখচিত প্রস্তরের জিনিষ, পুতুল ও সম্বর হ্রদের লবণ নির্ম্মিত একটী গ্লাস দেখিয়া, আমরা মুক্তকণ্ঠে তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

৮ই সেপ্টেম্বর—আমরা জয়পুরের দেবালয় সমূহ পরিদর্শন করিলাম। জয়পুর এখনও হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ। দেব মন্দির সমূহের মধ্যে মদনমোহন বা ঠাকুরজী শ্রীগোবিন্দজী, গোপীনাথজী, রামচন্দ্রজী ও গোকুল নাথ বা গোকুল চন্দ্রমা মন্দিরই প্রধান। মদন মোহন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সপ্ত মূর্ত্তির এক মূর্ত্তি। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাকি এই মূর্ত্তিতে জয়পুর অবস্থান করিতেছেন। মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক গোবিন্দজীর (মদন মোহন) মূর্ত্তি বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে আনীত হয়। রমণী মোহন মদন মোহনের পূজার্চ্চনা আজিও একজন রমণী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।

গোকুল নাথ বা গোকুল চন্দ্রমা মূর্ত্তি বৈষ্ণব প্রবর বল্লভাচার্য্য যমুনাতীরস্থ একটী বিলের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া, আপনার শ্যালককে প্রদান করিলেন। তিনি এই বিগ্রহ মূর্ত্তি গোকুলপুরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জয়পুরে উহা কখন যে, আনীত হয় নির্ণয় করা সুকঠিন। বোধ হয় এই মূর্ত্তি ও মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল।

জয়পুরে শিলা দেবী মন্দিরে এক শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি আছে।

তৎসম্বন্ধে মহাত্মা টড লিখিয়া গিয়াছেন—একদা সম্রাট ১ম বাহাদুর সাহা কুরু পাণ্ডবের সেই সমর-লীলাভূমি দেখিবার জন্য, আপন হিন্দু ও মুসলমান অমাত্যবর্গ সহ, কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ভ্রমণার্থ যাইয়া, অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন বাদসাহ স্বীয় রাজপুত মহিলার সহ এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী গৃধ্র এক খণ্ড অস্থি মুখে করিয়া, এক বৃক্ষের উপর আসিয়া বসিল। বৃক্ষ তলেই "ভীষ্মকুণ্ড" নামে এক পবিত্র জল কুণ্ড। গৃধ্রের চঞ্চু হইতে অস্থি খণ্ড কুণ্ডে পড়িয়া যাওয়া মাত্র, পক্ষীবর মনুষ্যের ন্যায় হাসিয়া উঠিল। সে সময় সকলে কৌতূহল-পরবশ হইয়া, কারণ অনুসন্ধিৎসু হইলে, গৃধ্র বলিল "আমি কুরুক্ষেত্র সমরের সময় একজন যোগিনী ছিলাম। সেই সময় যুদ্ধ নিহত এক বীর পুরুষের একখানা বাহু লইয়া, আমি পলায়ন করিয়াছিলাম। সেই বাহু-পরিহিত স্বর্ণ বলয়ে রক্ষাকবচের ন্যায় তেরটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। আমি সেই বাহুর অস্থি মাংস ভক্ষণ করিয়া, সেই স্বর্ণ বলয় এই কুণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। আজি এই অস্থিখণ্ডও আবার ইহাতে পতিত হওয়াতে, সে পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, আমি হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না।" ইহা শুনিয়াই সম্রাট ভৃত্য বর্গের দ্বারা সেই কুণ্ডের জল তুলিয়া ফেলিলেন ও কুণ্ড মধ্যে এক স্বর্ণ বলয় প্রাপ্ত হইলেন। সেই বলয়ে ত্রয়োদশটী শিব লিঙ্গ কবচ স্বরূপে গ্রথিত ছিল। সম্রাটের

হিন্দু-সামন্ত-রাজ জয়পুরাধিপতি জয় সিংহ ও যোধপুরাধিপতি অজিত সিংহ উহা প্রার্থনা করিলে, মহারাজা জয় সিংহ দুইটী ও অজিত সিংহ একটী প্রাপ্ত হইলেন। জয় সিংহ তাহা জয়পুরস্থ শিলা দেবী ও অপরটী গোবিন্দের মন্দিরে স্থাপিত করিলেন। অজিত সিংহও আপনটী যোধপুরের গিরিধারী মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই শিবলিঙ্গ এক একটী পরিমাণে একসের হইবে। এইরূপ ত্রয়োদশটী শিব মূর্ত্তি যেই বলয়ে নিবিষ্ট ছিল, তদ্রূপ বৃহদাকৃতির বলয়-ধারী বীরপুরুষের শরীর গঠন কিরূপ ভীষণ ছিল; তাহা আজিকালিকার লোকের ধারণা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজ্য সমূহের মধ্যে জয়পুরের ন্যায় সুন্দর সহর আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজা রামসিংহ জলের কল ও গ্যাসের আলো ইত্যাদির প্রচলন করিয়া, জয়পুর আরো অধিক মনোরম্য করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় কলিকাতাকে অনেক বিষয়ে জয়পুরের নিকট পরাস্ত মানিতে হয়। জয়পুরের চতুর্দ্দিকই প্রকৃতি বিনির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় পাহাড় বেষ্টিত। উত্তরে পাহাড়ের শিরোদেশে পর্ব্বত দুর্গ, (Hill-fort) শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিতের ন্যায়, জয়পুর সহর হইতে ধপ ধপ পরিলক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে এ স্থান যে বালুসাগর ছিল, জয়পুরের সঙ্কীর্ণ গলিগুলি পরিদর্শন করিলেই, তাহা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

জয়পুর রাজপুতানার মধ্যস্থানে সংস্থাপিত। ইহার উত্তর সীমা বিকানীর, পাতিয়ালা, ও হিসার; পূর্ব্বসীমা ভরতপুর ও আলোয়ার রাজ্য; দক্ষিণে কেরোলী, গোয়ালিয়র, বুন্দী, টোঙ্ক, মেওয়ার রাজ্য; পশ্চিম সীমা কিষণগড়, মারওয়ার ও বিকানিয়ার রাজ্য। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫০ মাইল ও প্রশস্তে ১৪০ মাইল।

জয়পুর রাজ্য ১১টী ডিষ্ট্রিক্টে বিভক্ত। যথা জয়পুর, দেওসা, শিকাবতী, তারাবতী, সম্বর, হিন্দন, গঙ্গাপুর, মাউরা, মালপুর, মাধবপুর এবং কোটে কাশিম। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শিপাহী বিদ্রোহের সময় জয়পুর দরবারের সাহায্যে সন্তুষ্ট হইয়া, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মহারাজকে কোটে কাশিম প্রদান করিয়াছেন।

জয়পুরের রাজন্যবর্গ কুশাবহ রাজপুত হইতে সমুদ্ভূত। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ তনয় লব অযোধ্যার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে, কনিষ্ঠ কুশ রোটসে রাজ্য স্থাপন করিলেন। ক্রমে কুশ-বংশ বিস্তৃত হইলে, তাঁহারা শোণ নদীর তীরে যাইয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন। সে স্থানেও সঙ্কুলন হইল না। তখন তাঁহারা গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত নরবর * রাজ্যে যাইয়া, রাজপাট স্থাপন করিলেন। সে সময় ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ব্বিদদিগের পরামর্শে কুশাবহ-বংশোদ্ভব সোরদেব নামক জনৈক যোদ্ধা ১০ম শতাব্দীতে, নরবর রাজ্য হইতে

* নরবর নল রাজার রাজ্য বলিয়া অভিহিত।

আসিয়া, রাজপুতানার মরু-স্থানে মীনাদিগকে বশীভূত করিয়া, ধুন্ধর † রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎকালে মাড়ি (বর্ত্তমান নাম রামগড়) নামক স্থানে উহাদিগের রাজধানী ছিল। সোরদেব পুত্র দুলারাও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, বর্ত্তমান জয়পুরের ৩ মাইল পূর্ব্বে খোর মীনা রাজাকে পরাজয় করিয়া, তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। দুলারাও হইতে আরম্ভ করিয়া ৬জন নৃপতির পর, বিজুলজীর রাজত্বকালে ধুন্ধারের রাজধানী খো হইতে আম্বেরে আনীত হইল। পৃথ্বীরাজের পতনের পর, বিজুলজীর পিতা মুসলমানদিগের অধীনে এক সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক পুরুষ পরেই মহারাজা ভগবান দাস আকবরের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া, ভ্রাতষ্পুত্র মানসিংহকে সম্রাট সেনায় এক মানসুবাদারী পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মহারাজা মানসিংহের সময়ই জয়পুর রাজ্যের শোভা সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিল ও এই রাজবংশ "রাও" উপাধি ত্যাগ করিয়া, রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মানসিংহের পুত্র কুমার জগত সিংহের অকাল মৃত্যু হইলে পর, তৎপুত্র ভবসিংহ আম্বেরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। এই ভবসিংহের পৌত্র জয়সিংহই সম্রাট আরঙ্গজীবের সময় দাক্ষিণাত্যে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া "মির্জা রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন ও

---

† জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম ধুন্ধর।

পরিশেষে আরঙ্গজীব চক্রান্তে দাক্ষিণাত্যে নিহত হইলেন। প্রথম জয়সিংহের প্রপৌত্র সেওয়াই * জয়সিংহ আম্বের হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের প্ররোচনায় বর্ত্তমান জয়পুর সহর নির্ম্মাণ করিয়া, আপন নামানুসারে উহার জয়পুর নামকরণ করিলেন। মহারাজা সেওয়াই জয়সিংহের সময়ই সম্রাট ফিরোকসিয়ার জয়পুর রাজ্যটী একবার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। জয়সিংহও সে সময় মারোয়ার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া, তাঁহার সাহায্যে মুসলমানদিগকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন ও সম্বর অধিকার করিয়া, উহা তিনি স্বয়ং ও মারোয়ার রাজ বিভাগ করিয়া লইলেন। পরে আবার ফিরোকসিয়ারের সময় মোগল ক্ষমতা হীন-দশাগ্রস্ত হইলে, ভরতপুরের জাটগণ আপনাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। জয়সিংহ তাহাদের সর্দারকে বন্দী করিয়া, বদনসিংহ নামক একজন স্বপক্ষীয়কে ভরতপুরে ভিন্ন রাজা রূপে স্থাপন করিলেন। সম্রাটও ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে "সারমদাই রাজাহাই হিন্দুস্থান" উপাধি প্রদান করিলেন। মহারাজা জয়সিংহের রাজত্বের পর ক্রমে ৪ জন রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তৎপর প্রতাপসিংহের রাজত্ব কালে মেচারি (আলোয়ার) স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল ও পিণ্ডারি সরদার মির খাঁ টোঙ্ক রাজ্য স্থাপন করিয়া, জয়পুরের কতক অংশ আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

---

* সেওয়াই শব্দে এক ও এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ সোয়া বুঝায়।

মহারাজা জগৎ সিংহের শাসন কালে (১৮৭০ সম্বতে) ব্রিটিস রাজ্যের সহিত সন্ধি হইয়া জয়পুর করদ মিত্র রাজ্যে পরিণত হইল। পাঠক বর্গের অবগতির জন্য সেই সন্ধিপত্রের অনুবাদ ও জয়পুর রাজবংশ তালিকা আমরা পরে প্রকাশ করিলাম। বর্ত্তমান মহারাজা মাধবসিংহের পিতা মহারাজা রামসিংহ ১॥ বৎসরের সময় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময় রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে, এসিষ্টেন্ট এজেণ্ট গবর্ণর জেনেরল মিঃ ব্লেক (Assistant Agent Governor General Mr. Blake) সাহেব জয়পুরে উপস্থিত হইলে, তিনি অন্যায় রূপে নিহত হইলেন। সেই অপরাধে দেওয়ান রামচাঁদের ফাঁসি ও সিঙ্গি যুথারাম চুণার দুর্গে চির-নির্ব্বাসিত হইলেন। মহারাজা রামসিংহের সময়ই জয়পুর নিতান্ত শোভা সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিল। বাল্য হইতেই মহারাজা রামসিংহ নিতান্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিলেন। একদা ভারতবর্ষের একজন গবর্ণর জেনেরেল জয়পুরে উপস্থিত হইলেন। রামসিংহ সে সময় নিতান্ত বালক। বড় লাট তাঁহাকে কোলে তুলিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রামসিংহ কতক্ষণ তাঁহার কোলে বসিয়াই বলিলেন "আমাকে নামাইয়া দাও। তোমার বড় কষ্ট হইতেছে।" তখন বড় লাট বলিলেন। "না মহারাজ, আমার কোন কষ্ট হয় নাই, আপনি বসুন।" অমনি বালক রামসিংহ বলিলেন "হাঁ এত বড় রাজ্যের ভার তোমার উপর,

আমার সামান্য ভারে তোমার কষ্ট হইবে কেন?” বড় লাট ইহা শুনিয়া, রামসিংহকে স্নেহ চুম্বন না করিয়া, থাকিতে পারিলেন না।

সন্ধিপত্র।

মহারাজা জগতসিংহের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিম্নলিখিত রূপ সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল।

“মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে, মহামান্য গবর্ণর জেনেরল মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস কর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত মিঃ চার্লস্ থিয়োফিলাস্ মেট্‌কাফ্। রাজরাজেন্দ্র শ্রীমহারাজাধিরাজ সেওয়াই জগতসিংহ বাহাদুরের পক্ষে ঠাকুর রাউল বৈরীশূল নাথবন্ত।

১ম। মহামান্য কোম্পানি ও মহারাজা জগৎ সিংহ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের চির বন্ধুত্ব, সমবেদনা ও একতা সংস্থাপিত হইবে। এক রাজ্যের শত্রু ও মিত্র অপর রাজ্যের শত্রু ও মিত্র মধ্যে পরিগণিত হইবে।

২। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট জয়পুর রাজ্য রক্ষার্থে ও তাহার শত্রুগণকে দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

৩। মহারাজা সেওয়াই জগত সিংহ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহযোগীতা অবলম্বন ও তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন।

৪। মহারাজা এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে না জানাইয়া, কোন রাজা বা রাজকুলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন না। কিন্তু বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের সহিত যেরূপ সমালাপ চলিয়া থাকে, তদ্রূপই করিতে পারিবেন।

৫। মহারাজা ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ কাহারো উপর কোন রূপ অত্যাচার করিতে পারিবেন না। কাহারো সহিত কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাহার বিচার ও মীমাংসা অর্পিত হইবে।

৬। জয়পুর দরবারের ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিত রূপ কর প্রদান করিতে হইবে। জয়পুর রাজ্যের বর্ত্তমান গোলযোগ নিবন্ধন, প্রথম বৎসর কর মাপ। দ্বিতীয় বৎসর ৪ লক্ষ টাকা; ৩য় বৎসর ৫ লক্ষ; ৪র্থ বৎসর ৬ লক্ষ; ৫ম বৎসর ৭ লক্ষ; ৬ ষ্ঠ বৎসর ৮ লক্ষ ও তৎপরবর্ত্তী প্রতি বর্ষে ৪০ লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব বৃদ্ধি পর্য্যন্ত, ৮ লক্ষ টাকা কর দিতে হইবে। জয়পুর রাজ্যের রাজস্ব ৪০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে, নির্দ্দিষ্ট কর ব্যতীত বর্দ্ধিত রাজস্বের পঞ্চ-ষোড়শাংশ অর্থাৎ ৫ আনা আর ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে হইবে।

৭। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক হইলে, জয়পুর দরবারকে অবস্থানুসারে সৈন্য যোগাইতে হইবে।

মহারাজা ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ পূর্ব্ব প্রথানুসারে রাজ্যের একচ্ছত্রী অধিপতি থাকিবেন। ব্রিটিষ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের কোন আধিপত্য জয়পুরে চলিবে না।

৯। মহারাজা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত এরূপ বিশ্বস্ত সূত্রে আবদ্ধ থাকিবেন। তাঁহার সুখ শান্তি বর্দ্ধনে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা মনোযোগ করিবেন।

১০। এই দশসূত্র সম্বলিত সন্ধি পত্র লিখিত ও পঠিত হইয়া, মিঃ চার্লস্ থিয়োফিলাস মেট্‌কাফ্ ও ঠাকুর রাউল বৈরীশূল নাথবস্ত কর্ত্তৃক সাক্ষরিত ও মোহর যুক্ত হইল। ইহা অদ্য হইতে একমাসের মধ্যে মহামান্য গবর্ণর জেনেরেল ও রাজ রাজেন্দ্র শ্রীমহারাজাধিরাজ সেওয়াই জগত সিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও পরস্পর পরিবর্ত্তিত হইবে।

তারিখ, দিল্লী
২রা এপ্রিল ১৮১৮ খৃঃ

জয়পুর রাজবংশ তালিকা।

নাম	ক্রম	সম্বৎ
সৌরদেব	(১)	
দুলারাও	(২)	
কঙ্কুল	(৩)	১০৯৩ সম্বৎ
হনুজী	(৪)	১০৯৩ „
জনার্দ্দন	(৫)	১১১০ „
পাজুন	(৬)	১১২৭ „
মলসাজী	(৭)	১১৫১ „
বিজুলুজী	(৮)	১২২৬ „
কিলান	(৯)	১২৭০ „
কুতুল	(১০)	
জৈনসিজী	(১১)	
উদয়করণজী	(১২)	
নরসিংহজী	(১৩)	
বনবীরজী	(১৪)	
ওধারণজী	(১৫)	

- উদ্ধারণ জী
  - চন্দ্রসেনজী (১৬)
    - পৃথ্বীরাজ (১৭)
      - পূরণ মল (১৮)
      - ভীমাজী (১৯)
        - রতনজী (২০) ১৫৯৩ সম্বৎ
        - আসকরণজী (২৬) ১৬০৪ সম্বৎ
      - ভরমল (২১)
        - একপুত্র
          - মানসিংহ (২৪)
            - জগত সিংহ
              - একপুত্র
                - জয়সিংহ—মির্জারাজা (২৬)
                  - রামসিংহ (২৭)
                    - কিষণসিংহ (২৮)
                      - সেওয়াই জয় সিংহ—সারমাদাই রাজাহাই হিন্দুস্থান (২৯)
                        - ঈশ্বরী সিংহ (৩০)
                        - মাধব সিংহ (৩১)
              - ভবসিংহ (২৫)
        - ভগবান দাস (২৩)

মাধব সিংহ

পৃথ্বীসিংহ (৩২)

প্রতাপসিংহ (৩৩)

জগৎ সিংহ (৩৪)
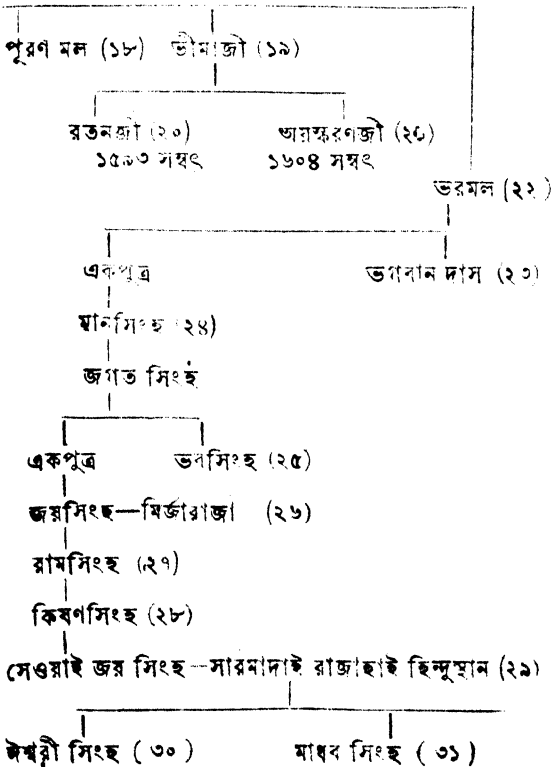
জয় সিংহ (৩৫)

রাম সিংহ (৩৬)

মাধব সিংহ (৩৭)

জয়পুর পলিটিকেল এজেন্সি।

লেপ্টেনেণ্ট এ, সি, টেলবট পলিটিকেল এজেণ্ট। মিঃ ডব্লিউ, হাউয়ার্ড, হেড্ এসিষ্টেণ্ট।

পঞ্চায়েত সভা——লেপ্টেনেণ্ট এ, সি, টেলবট সভাপতি। জয়পুর, যোধপুর, আলোয়ার বিকানীর, কিষণগড়, টোঙ্ক, ও কেরোলীর উকীলগণ সভ্য। উল্লিখিত রাজ্য সমূহ জয়পুর এজেন্সির অন্তর্গত। একটী ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস ও চিকিৎসা বিভাগ জয়পুর এজেন্সির অধীনে নিযুক্ত আছে।

জয়পুর কাউন্সিল।

মহারাজা ও পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেব—সভাপতি। প্রধান মন্ত্রী—সহকারী সভাপতি। তদ্ভিন্ন ৯জন মেম্বর, একজন সেক্রেটরী ও একজন এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটরী লইয়া এই সভা গঠিত। সভার ইংরেজী বিভাগের জন্য একজন ভিন্ন কর্ম্মচারী আছেন। মহারাজের একজন প্রাইভেট সেক্রেটরি। তাঁহার সহিত এই সভার কোন সংশ্রব নাই।

আদালত।

আপিল আদালতে একজন ফৌজদার, একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও একজন কোতোয়াল আছে।

দেওয়ানী আদালতে ২ জন জজ; মুন্সেফি আদালতে ২ জন মুন্‌সেফ; রেভিনিউ কাচারীতে ২ জন দেওয়ান; ট্রেজারিতে ১ জন মোতামিম। হিসাব সক্রান্ত আফিসে (Accountant Department.) ১ জন মোতামিম্; টাকশালার একজন দারোগা, কাষ্টম ডিপার্টমেণ্টে একজন মুন্তাজিম্; ষ্টেম্প ডিপার্টমেণ্টে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; কারখানাতে একজন মোতামিম, জেলে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; সহরের পূর্ত্ত বিভাগে ২ জন দারোগা; গেস্‌ওয়াকে ১ জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ১ ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজার, ১ জন এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার; ডাক বিভাগে একজন

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। এই সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারী দিগের অধীনে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে।

বিদ্যালয়।

মহারাজা কলেজ, রাজপুত স্কুল, সংস্কৃত কলেজ, আর্ট স্কুল, ও বালিকা বিদ্যালয়, বহুসংখ্যক অধ্যাক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষাধীনে সহরে অবস্থিত। তদ্ভিন্ন গ্রাম্য স্কুল সকল পরিদর্শনার্থে একজন ইনস্পেক্টর নিযুক্ত আছেন।

চিকিৎসালয়।

মেওহাসপাতালে—একজন সিভিল সার্জন, একজন এসিষ্টেণ্ট সার্জন, ২ জন নেটিভ ডাক্তার, ১ জন ষ্টোর কিপার, একজন কম্পাউণ্ডার ও একজন কেরাণী আছে। সহরের শাখা ডিস্‌পেন্সারীতে ১ জন নেটিভ ডাক্তার; পুরানা বসতী ডিস্‌পেন্সারীতে ১ জন নেটিভ ডাক্তার, মতি কাটলা ডিসপেন্সারীতে ১ জন নেটিভ ডাক্তার ও টিকা-বিভাগে সিভিল সার্জন ইনস্‌পেক্টর, ১ জন নেটিভ সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট ও ১৪ জন টীকাদার আছে।

পূর্ত্ত বিভাগ।

একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, একজন এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, তিনজন ওভারসিয়ার, একজন একাউণ্টেণ্ট, এক-

জন হেডক্লার্ক, একজন সেরেস্তাদার, একজন ড্রেফ্‌ট্‌স্‌মেন ও একজন সেকেণ্ড ক্লার্ক আছে। জলের কলে—একজন ইঞ্জিনিয়ার, ও একজন এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারই প্রধান কর্ম্মচারী।

এতদ্ভিন্ন জয়পুর পাবলিক্‌ লাইব্রেরী, রাম নিবাস বাগ, মহারাজার বেণ্ড ও মিউজিয়মে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে।

মফস্বলে ফৌজদারগণের অধীনেই প্রত্যেক স্থান শাসিত হইয়া থাকে।

জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী আম্বের জয়পুর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। মহারাজা মানসিংহ অপহৃত যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্যের কালী মূর্ত্তি এখন ও আম্বেরে থাকিয়া, অর্চ্চিত হইতেছেন। আম্বেরে গালব মুনির আশ্রম ছিল বলিয়া, ইহা অতিশয় প্রসিদ্ধ। জয়পুর হইতে আম্বেরের পথ গিরিসঙ্কুল হওয়াতে, দিব্য দর্শনীয় ও মনোহর। তথাকার রাজভবন ও একটী দ্রষ্টব্য বিষয়।

দশম অধ্যায়।

আজমীর-নসীরাবাদ।

১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে জয়পুর হইতে ট্রেণ চাপিয়া, তৎপর দিবস বেলা ১১টার সময় আমরা আজমীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। আজমীরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ যে, আরও অধিক পাহাড় সঙ্কুল, গাড়ীতে বসিয়াই, আমরা তাহা বেশ পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। ট্রেণ আজমীরে পৌঁছিলে পর, আমরা এক খানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, আমাদের একজন স্বদেশী বন্ধুর বাড়ীতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। তথায় দীর্ঘকাল থাকিয়া, সে স্থান হইতে আমরা রাজপুতানার অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিব বলিয়া স্থির করিলাম। আমাদের স্বদেশী বন্ধুর বাড়ীতে কতক দিন খুব স্থখসচ্ছন্দে ও আমোদ প্রমোদে অবস্থান করিয়া, আমরা আজমীর সহরের মধ্যে একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া, তথায় ভিন্ন বাস করিতে লাগিলাম। বিদেশে স্বদেশী লোকের সহবাস কতদূর সুখপ্রদ, আমরা আজমীরে তাহা বেশ উপভোগ করিয়াছিলাম। আমাদের স্বদেশী বন্ধু মহাশয় রাজপুতানার ডিসবার্সিং পোষ্ট মাষ্টার, নাম শ্রীযুক্ত বাবু বি——। তিনি আজমীরে থাকাতে, তথায় অবস্থান কালীন আমরা অনেক বিষয়ে নির্ভয় থাকিতে

পারিয়া ছিলাম। তৎজন্য আমরা তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

রাজপুতানার মধ্যে আজমীর একটী প্রাচীন স্থান। আজমীরের প্রাচীন নাম "গড় বিটলি"। চোহানগণ মকাবতীতে (গড় মণ্ডল) সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলে, উহাদের বংশধরগণ ক্রমশঃ পূর্ব্বগামী হইতে লাগিল। অজয় পাল (অজপাল-ছাগরক্ষক) চাকবা (রাজচক্রবর্ত্তী) নামক জনৈক চোহান সম্বৎ ২৩২ শকে এস্থানে আরাবলী পর্ব্বত শিখরে অজয়মেরু দুর্গ (যাহার বর্ত্তমান নাম তারাগড়) নির্ম্মাণ করিয়া, এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ অজয়পাল হইতে কিম্বা অজয়মেরু হইতেই বর্ত্তমান আজমীর নামের উৎপত্তি। রাজচক্রবর্ত্তী অজয় পাল হইতে চোহানকুল-গরিমা পৃথিরাজ পর্য্যন্ত আঠার জন রাজাও তৎপরে আরো দুইজন চোহান রাজা আজমীরে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।* আমরা তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। আজমীরের চোহান রাজা দিগের তৃতীয় রাজা মাণিক রায়ের সময় মুসলমান দিগের সহিত একযুদ্ধ হয়; তিনি তাহাতে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার পলায়ন সময় অবলম্বন করিয়াই, সম্বর হ্রদের সৃষ্টি সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তি আছে। আমরা সম্বরের বিবরণে তাহা

---

* মহারাজা মাণিক রায় হইতে বিশাল দেব পর্য্যন্ত আজমীরের সিংহাসনে ১১ জন নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ৬ জন নৃপতির নাম পাওয়া যায় না।

পাঠকদিগকে জানাইব। হর্ষ রাজের (তাহার অন্য নাম ধর্ম্মাধিরাজ) সহিত সবেক্তিগিনের এক তুমুল সংগ্রাম হয়। তাহাতে তিনি জয়ী হইয়া, মুসলমানদিগকে আজমীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, অরিমর্দ্দন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কুজগণদেবও সবক্তিগিনকে পরাজয় ও তাঁহার নিকট হইতে ১২০০ ঘোটক লাভ করিয়া, "সুলতানগ্রহ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজা বীরবিলুন দেব গজনির সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া, সমরে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু তৎপুত্র বিশাল দেব মোদাদকে পরাস্ত করিয়া, মুসলমানদিগকে নিতান্ত হীনদশা করিয়াছিলেন। আজমীর রাজগণের মহৎকার্য্যের মধ্যে, বিশালদেবের এই যুদ্ধ অতিশয় প্রসিদ্ধ। এমন কি এই যুদ্ধে রাজপুতানার অধিকাংশ নৃপতিই তাঁহার পতাকা মূলে আহুত হইয়াছিলেন। এই বিশালদেব এক যুদ্ধে পরাক্রান্ত দিল্লীশ্বরকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। আজমীরের সপ্তদশ অধিপতি সোমেশ্বর দিল্লীশ্বর তৃতীয় অনঙ্গপালের দ্বিতীয় কন্যা কমলাবাইকে বিবাহ করেন। তৎপুত্র পৃথ্বীরাজই পরে দৌহিত্র সূত্রে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। অনঙ্গপালের প্রথম কন্যার গর্ভজাত কনোজ রাজ জয়চাঁদ মাতামহ রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া, পৃথ্বীরাজের পরম শত্রু রূপে হৃদয়ে হিংসা-বহ্নি প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে চিতোরের তৎকালীন অধীশ্বর সমরসিংহ পৃথ্বীরাজ সহোদরা

পৃথার পাণিগ্রহণ করাতে, তিনিও জয়চাঁদের ঘৃণার ভাজন হইয়া দাঁড়াইলেন। এমন কি, পৃথ্বীরাজ মহা গৌরবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিলেন পরে, জয়চাঁদও হিংসা পরবশ হইয়া কনোজে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ও ভারত-নৃপতিবৃন্দকে ছলনা ক্রমে যজ্ঞে উপস্থিত করার মানসে, তৎসঙ্গে আপন কন্যা "সংযুক্তার" সয়ম্বর সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। জয়চাঁদ সেই যজ্ঞে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের নিমন্ত্রণ না করিয়া, অপমান অভিলাষে, তাঁহাদের স্বর্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, সভা গৃহের দ্বারদেশে প্রহরী স্বরূপ রাখিয়া দিলেন। রাজকুমারী সেই স্বর্ণ-নির্ম্মিত পৃথ্বীরাজের গলেই মাল্য পরাইয়া, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। পৃথ্বীরাজও অকস্মাৎ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া, সংযুক্তাকে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিলেন।

দৃষদ্বতী তীরে মুসলমান সমরে পৃথ্বীরাজ ও তৎপুত্র রণসিংহ নিহত হইলে পরও আজমীর দুই জন চোহান রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। মিবার যে সময় আপন বল বিক্রম জগত সমীপে প্রকাশ করিতে পারে নাই, আজমীর সে সময় সমৃদ্ধি সম্পন্ন। বলিতে গেলে আজমীর রাজপুতানার অতি প্রাচীন রাজ্য। চোহান বংশ পতনের পর উহা প্রথমতঃ সাহাবুদ্দিনের অধীন হইয়া পড়িল। রাজপুতগণ কর্ত্তৃক ১২১৯ খৃঃ অব্দে উহার পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। পরে উহা ক্রমে ক্রমে মিবার ও মালবরাজের হস্তগত হইয়া, মোগলদিগের করায়ত্ত

আজমীরের চোহান রাজবংশ তালিকা।
(অর্থাৎ রাজচক্রবর্তী)
মানিক রায়
বিশাল দেব
জয়পাল
বিজয় দেব
আনন্দ দেব
সোমেশ্বর
পৃথ্বীরাজ
(মুসলমান হন)
বিজয় রাজ
(পৃথ্বীরাজের উত্তরাধিকারী)
লক্ষণ সিংহ
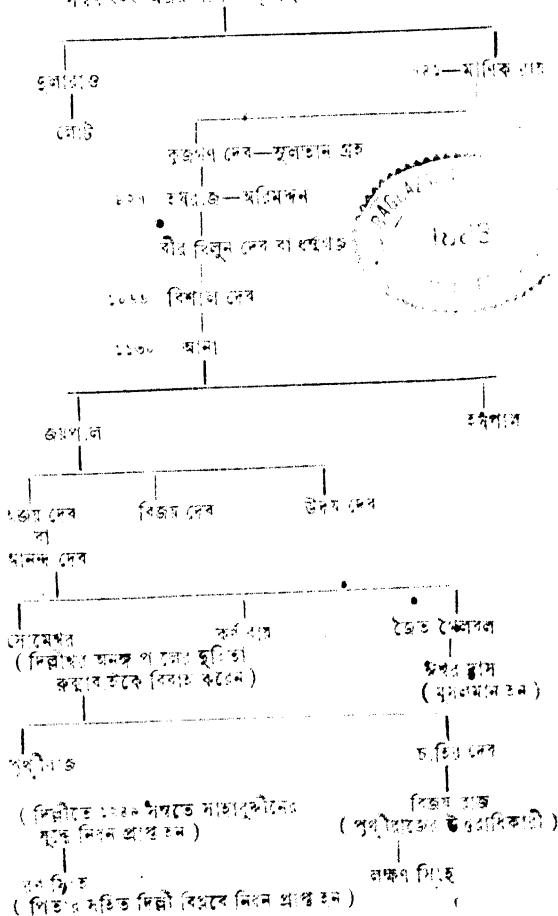
হইল। এ স্থানেই ১৬১৫ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীর ব্রিটিষ দূত সার টমাস রো (Sir Thomas Row) সাহেবকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা আবার যোধপুর রাজ্যের অধীন হইয়া, মহারাজা সিন্ধিয়ার হস্তগত হইল। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়া বাহাদুর ব্রিটিষ রাজকে আজমীর প্রদান করিলেন। তদবধিই ইহা ব্রিটিষ অধিকারে শাসিত।

সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে আজমীর, নসীরাবাদ, নিমচ, রেওয়ারি ও আবুই এক মাত্র ইংরেজ রাজ্য। অতীতের সাক্ষী স্বরূপ এখনও আজমীরে দেখিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। এখনও আজমীরে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের অনেক চিহ্ন বিরাজমান থাকিয়া, ভ্রমণকারীদিগের হৃদয়ে শোকবহ্নি ঢালিয়া দিতেছে। আমরা দীর্ঘকাল আজমীরে থাকিয়া, সে সমুদয় সম্যক পরিদর্শন করিয়া লইলাম।

বর্ত্তমান আজমীর আধুনিক সহর—মোগল রাজত্বের মধ্যভাগে নির্ম্মিত। ইহা ও একটী দুর্গবদ্ধ সহর। পূর্ব্বভাগে যে একটী গভীর পরিখা ছিল, তাহার চিহ্ন এখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজমীর সহরের পাঁচটী তোরণ (Gate) আছে—যথা দিল্লী, আগ্রা, মাদার, উস্রী, ত্রিপলী দরওয়াজা। সহরের উত্তর প্রান্তে "আনা সাগর" নামে একটী হ্রদ বিরাজমান। চোহান কালের মহারাজা বিশাল দেবের পর মহারাজা

আনা এই সরোবর খনন করিয়া, আপন নামে ইহার আনা সাগর নাম রাখিয়াছেন। আনা সাগরের পূর্ব্ব পাড়েই সম্রাট সাজাহানের দেওয়ান খাস—এখন শ্রীহীন কলেবরে বিরাজ করিতেছে।

আজমীরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে তারাগড় উচ্চ শিরে দাঁড়াইয়া, এখনও অজয়পাল রাজের সেই অজয় মেরু দুর্গের পরিচয় দিতেছে। চোহানরাজকুলের রাজত্বকালীন তারাগড়ই তাঁহাদের পর্ব্বত দুর্গ (Hill Fort) ছিল। তারাগড় এত উচ্চ যে, বর্ষার সময় আমরা উহার শিখর দেশে মেঘ বাঁধিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। তারাগড়ের উপরিভাগে একটী তোরণ ভিন্ন এখন প্রাচীন দুর্গের অন্য কোন পুরাতন চিহ্ন নাই। এই তোরণটী গুমানজী সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিতান্ত স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া, উহা এখন পীড়িত ইয়োরোপীয় সৈন্যদিগের (Invalid soldiers) বাসস্থান নির্ণীত হইয়াছে। তারাগড়ের উপরিভাগেই মিরাণহোসেনের দরগা। ইহা আকবর সামন্ত জব্বর খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। দরগার খরচ নির্ব্বাহার্থে এখনও চারি সহস্র টাকা বার্ষিক আয়ের ভূমি দরগোত্তর (দেবোত্তর) বিত্তরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। সেস্থান হইতে চারিদিকের দৃশ্য বড় মনোহর দৃষ্ট হয়। উপর হইতে ছোট ছোট ক্ষেত্রগুলিকে শতরঞ্চ খেলার ঘরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তারাগড়ের পূর্ব্ব প্রান্তে একটী প্রাচীন পুকুর দেখিয়া, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যেন কেমন একটা ভাব

আসিয়া অগ্রসর হইল। তখন মনে ভাবিলাম, এ পুকুরটি গভীরভাবে বসিয়া, কত কালের পরিবর্ত্তন দেখিয়াছে। এ পুকুরই কত জীবকে হাসিয়া খেলিয়া, জল বুদ্বুদের মত অনন্তে মিশিয়া যাইতে দেখিয়াছে। আমরা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় তারাগড়ের শিখর দেশে বসিয়া সূর্য্যাস্ত পরিদর্শন করিতাম ও পরে ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিতাম।

১৮ই সেপ্টেম্বর—আমরা আজমীরের কাছারী ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়া, বিকাল বেলা "আঢাইদিনকা ঝোপড়" (আড়াই দিনের ঝোপড়া) পরিদর্শন করিলাম। ইহা একটী মনোহর হর্ম্ম্য। নানা প্রকার কারুখচিত প্রস্তর খণ্ডে গ্রথিত থাকিয়া, এখনও ভারতের লুপ্ত-শিল্পের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। গৃহটী এখন এক প্রকার ছাদ শূন্য। "আঢাই দিনকা ঝোপড়া" সম্বন্ধে, সেখানকার অধিবাসীগণ আমাদিগকে নানা প্রকার বিবরণই বলিয়াছিল। কেহ বলিল আল্টামাস আজমীর হইতে তারাগড়ে যাওয়ার কালীন, ইহা নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি করিয়া যান। তিনি আড়াই দিন পরে সহরে ফিরিয়া আসিয়া, ইহা সম্পূর্ণ দেখিতে পাইলেন বলিয়া, ইহার নাম "আঢাই দিনকা ঝোপড়া" রাখিলেন। কেহ বলিল—কোন হিন্দু আঢ্য ব্যক্তি তাঁহার আড়াই দিনের আয় দ্বারা এ পরম সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, এই অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ঝোপড়ার অতি সন্নিকটে, সহরের দক্ষিণ প্রান্তেই সুপ্রসিদ্ধ খাজাসাহেবের দরগা। আমরা একদিন তথায় যাইয়া, জুতা ছাড়িয়া দরগা পরিদর্শন করিলাম। খাজাসাহেবের দরগার মধ্যে "খাঙ্গারা" নামে যে মসজিদ আছে, খাজাসাহেব আজমীরে আসিয়া, সেই স্থানেই প্রথমতঃ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। দরগাতে প্রবেশ করিলেই, নহবতখানাতে দুটি দমামা (Drums) দৃষ্ট হয়। বাদসাহ আকবর চিতোর হইতে আনিয়া, খাজাসাহেবের সম্মানার্থে উহা উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরেই সাজাহান নির্ম্মিত শ্বেত প্রস্তর মসজিদ দর্শনীয় বিষয়। দরগার পূর্ব্বপার্শ্বে খাজাসাহেব, তাঁহার দুই স্ত্রী ও কন্যা হাফিজ জামাল ও চিমনিবেগম এবং সাজাহান বাদসাহের এক কুমারীর সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। খাজাসাহেবের সমাধি গৃহের চন্দন কবাটদ্বয় আকবর চিতোর হইতে অপহরণ করিয়াছিলেন। খাজা সাহেবের বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাঠকবর্গকে পরে জানাইব। অনেকে বলিল—এ দরগার কোন নিভৃত স্থানে এখনও একটী শিব মূর্ত্তি লুক্কায়িত আছেন। কিন্তু আমরা তাহা দেখি নাই।

আমাদিগকে আজমীরে দীর্ঘবাস স্থির করিয়াই রাজপুতানার অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিতে হইয়াছিল। আমরা এখন কেবল আজমীরের বিবরণই পাঠকবর্গকে জানাইয়া, পরে অন্যান্য স্থানেরও ভ্রমণ বৃত্তান্ত জানাইব।

আমরা আজমীরে থাকিয়া অন্যান্য কতিপয় স্থান পরিদর্শন

করিলে পর, বাড়ী হইতে ভায়াকে গ্রেপ্তার করিতে লোক উপস্থিত। ভায়া আমাপেক্ষা বয়সে ছোট; এতদিন বিদেশ ভ্রমণেই তাহার মন একটুকু চঞ্চল হইয়াছে। এ সময় তাহার গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন আমিও উচিত বিবেচনা করিলাম। ভায়ার গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন স্থির হইলে, আমি তাহাকে রেলওয়ে ষ্টেষণে রাখিয়া আসিলাম। ষ্টেষণ হইতে একাকী ফিরিয়া আসিবার সময় আমার হৃদয় যে. কিরূপ উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। এ বন্ধু বান্ধব শূন্য ঘোর বিদেশে উভয়েই উভয়ের একমাত্র সহায় ছিলাম। কষ্টে পড়িলে উভয়ে উভয়ের মুখপানে তাকাইতাম। উভয়ে একত্র আহার করিতাম; একত্র বেড়াইতাম; রাত্রিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও দেবডাঙ্গার ন্যায় দু ভাইয়ে একত্র শয়ন করিয়া, কত কথায়, কত কি আলাপে রাত্রি কাটাইতাম। কিন্তু আজি ভায়াকে ছাড়িয়া, মনে ভাবিলাম—এ ঘোর বিদেশে একা থাকিব কেমন করিয়া? দুঃখে জীবন ঢালিয়া দিয়াছি, ইহা ভাবিলে আর কি হইবে? বড় প্রাণের ব্যথায় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, একাকী শুইয়া রহিলাম। সমস্ত রাত্রি একটুকুও ঘুম হইল না; শুইয়া শুইয়া কেবল ইহাই চিন্তা করিলাম—একা থাকিব কেমন করিয়া? কোন বিপদে পড়িলে, কে আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইবে? বাস্তবিক আমার তিন বৎসর কালব্যাপী বিদেশ ভ্রমণের সময়, আর কখনো মনে এইরূপ অশান্তি, এইরূপ কষ্ট উপভোগ করি নাই। কতক দিন মনের কষ্টে আর ঘরের বাহির

হইতাম না। একাকী বসিয়াই কেবল আপন অবস্থা ভাবিতাম। সুখের হউক, দুঃখের হউক, মানুষের মনের বেগ চিরদিন সমভাবে থাকে না। ক্রমে আমারও মনের বেগ একটু শীতল হইয়া আসিল।

আজমীরে দেখিবার মধ্যে আর একটী প্রধান বিষয় রহিয়াছে। উহা একটী সীসার খনি। একদিন দুইটী চাকর সমভিব্যাহারে লইয়া, আমি সীসার খনি পরিদর্শন করিতে চলিলাম। উশ্রী দরজার বাহিরেই ইহা অবস্থিত। খনিতে প্রবেশ করিবার রাস্তাটী, প্রবেশ দ্বার হইতে ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া, তারাগড়ের নীচে চলিয়া গিয়াছে। কোন হিংস্র জন্তু খনির মধ্যে যাইয়া লুকাইয়া থাকিবে ভয়ে, প্রবেশ দ্বার একখানা দৃঢ় কপাটে আবদ্ধ। অনেক দিন হইল একটা ব্যাঘ্র নাকি রাত্রিযোগে খনিতে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। একজন দর্শক খনি দর্শনার্থে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেই, ব্যাঘ্র তাহাকে ঘোর অন্ধকারময় পথে তাহার খনি দর্শন সাধ মিটাইয়া দিল। তদবধিই উহার দ্বারদেশটী সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকে। লণ্ঠন জ্বালাইয়া, ভৃত্যদ্বয়কে অগ্রে ও পশ্চাতে লণ্ঠন হস্তে রাখিয়া, আমি খনি মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ক্রমশঃ নিম্নগামী হইলে, অন্ধকার এত গাঢ়তর বোধ হইতে লাগিল যে, দুটী লণ্ঠনের আলোতেও সে স্থানে ভাল করিয়া কিছু দেখিতে পাইলাম না। একটী কথা বলিলে, তাহা চারিদিকে গম্ভীর শব্দে প্রতিধ্বনিত

হইয়া, বাঘের ভয় পুনরায় হৃদয়ের মধ্যে জাগাইয়া দেয়। এরূপ কতকদূর যাইয়া, আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। সে স্থানে যাইয়া দেখি, অনেক স্থান হইতে নির্ঝরিণী আকারে জল বাহির হইতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসও যেন বন্ধ হইয়া আসে। আমরা আর ভিতরে না যাইয়া, ফিরিয়া আসিলাম। পূর্ব্বে এখান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সীসা উৎপন্ন হইত। এখন তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে এক দিবস কয়েকজন বন্ধুর সহিত পুরাতন আজমীর দেখিতে গেলাম। ইহাই অতি পূর্ব্বে চোহান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। ইহার পূর্ব্ব নাম ইন্দ্রকোট, পরে মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া, মুসলমান রাজধানীতে পরিণত হয়। পুরাতন আজমীর তারাগড়ের পশ্চিম প্রান্তে একটী উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। দু একটী ভগ্ন মন্দির ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন চিহ্ন এখন সেখানে পরিলক্ষিত হইল না। পুরাতন আজমীরের একটী মন্দিরের দ্বারদেশে ফার্সী অক্ষরে এখনও কি যেন লেখা রহিয়াছে। কালস্রোতে তাহা অবধৌত প্রায়। সেই মন্দিরের এক প্রাচীর গাত্র হইতে অনবরত জল নির্গত হইতেছে দেখিয়া, আমরা বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা পুরাতন আজমীর পরিদর্শন করিলাম; পরে একটী নির্জ্জন পথ অবলম্বন করিয়া, গৃহ প্রত্যাগমন করিলাম।

আজমীরের প্রায় চারিদিকেই পাহাড়। তন্মধ্যে মাদার

পাহাড় প্রভৃতি কয়েকটী পাহাড়ই অতি প্রসিদ্ধ। আমরা মধ্যে মাঝে শিকারে বহির্গত হইয়া, সে সমস্ত পাহাড় যথানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়াছি।

মুসলমান রাজত্বের সময় বাদসাহ জাহাঙ্গীর আজমীরে "দৌলতা বাদ" নামে এক পরম সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে অবস্থান করিতেন। আজিও দৌলতা বাদ আজমীরের একটী মনোহর দৃশ্য। মোগল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃত্তান্ত জানাইতে যেন, মণি-খচিত বক্ষালঙ্কারের ন্যায় আজমীরের বক্ষ শোভিত করিয়া আছে।

আজমীরে সর্ব্বশুদ্ধ দুটী কলেজ ও পাঠশালার ন্যায় আর কয়েকটী বিদ্যালয় আছে। কলেজের একটী সর্ব্বসাধারণের জন্য, অপরটী রাজপুতানার রাজ কুমারদিগের জন্য স্থাপিত। এ স্থান হইতেই রাজপুতানা ও মালোয়া ষ্টেট রেলওয়ে (Rajputana and Malwa State Railway) একটী নসীরাবাদ অতিক্রম করিয়া, মালব দেশের দিকে, চলিয়া গিয়াছে। অন্যটী আমেদাবাদ হইয়া, বম্বে বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রেল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের (Bombay Boroda and Central India Railway) সহিত যাইয়া মিলিত হইয়াছে।

আজমীর বড় স্বাস্থ্যকর স্থান। পূর্ব্বে নহরের জল পান করাতে লোকের গিনি ওয়ার্ম (Guini worm) হইয়া, অনেকে পীড়িত হইত। এখন কলের জল হওয়াতে লোকের সে ভয় অনেকটা দূর হইয়াছে। আজমীর রাজপুতানার অন্যান্য

স্থানের ন্যায়, গ্রীষ্মের সময় তত দারুণ গ্রীষ্ম প্রধান অথবা শীতের সময় তত অসহ্য শীতপ্রধান নয়।

২৭ অক্টোবর আমরা "ঘোড় দৌড়" দেখিবার জন্য কয়েকটী বন্ধু মিলিয়া, নসীরাবাদ রওনা হইলাম। নসীরাবাদ আজমীর হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা ১৷৷০টার সময় ট্রেণ চাপিয়া এক ঘণ্টা পরেই নসীরাবাদ যাইয়া পৌছিলাম। নসীরাবাদ ইংরেজ অধিকারে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থান। তথায় ইংরেজের একটী সেনা-নিবাস আছে। আমরা সহরের সমুদয় স্থান দেখিয়া, বিকাল বেলা "ঘোড় দৌড়" দেখিলাম। ঘোড় দৌড়ের জন্য রাজপুতানার রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকের ঘোড়া উপস্থিত ছিল। তন্মধ্যে যোধপুর মহারাজের এক ভাইয়েরই এই আমোদে বিশেষ উৎসাহ দেখিলাম। আমরা ঘোড় দৌড় দেখিয়া, সন্ধ্যার সময় আমাদের একজন বন্ধুর বাড়ী যাইয়া, বিশ্রাম করিয়া জলযোগ করিলাম। তিনি থাকিতে অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু নসীরাবাদে দেখিবার আর কিছুই নাই বলিয়া, আমরা রাত্রির গাড়ীতে আবার আজমীরে ফিরিয়া আসিলাম।

—:০:—

একাদশ অধ্যায়।

খাজা সাহেব।

মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত সাজিস্থান নামক স্থানে ৫৩৭ হিজরী অর্থাৎ ১১২০ খৃঃঅব্দে একজন সাধুভক্ত ও দরিদ্র মুসলমানের গৃহে খাজাসাহেব জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা বালকের নাম মরিনুদ্দীন রাখিয়া, তাঁহার পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে, তাঁহাকে অতল দুঃখে ডুবাইয়া, পরলোক গমন করিলেন। একটী সামান্য ফলের বাগান ও একটী পাণি চাক্কী (জলের বেগে চালিত ময়দার কল) ব্যতীত বালকের জন্য পিতা আর কোন সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। এক দিবস প্রত্যূষে উদ্যানে জল সিঞ্চন কালীন, মরিনুদ্দীন দেখিলেন, ইব্রাহিম কন্দোজা নামক জনৈক স্বগ্রামস্থ বুজরুক ফকির সেস্থান হইয়া, অন্যত্র যাইতেছেন। মরিনুদ্দীন তাঁহাকে সসম্ভ্রমে ডাকিয়া, এক বৃক্ষতলে উপবেশন করাইলেন ও কতকগুলি সুপক্ক দ্রাক্ষাফল তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। ফকির বালকের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, নিজ বস্ত্র মধ্য হইতে এক খণ্ড খৈল বাহির করিয়া, নিজে চর্ব্বণ করিলেন ও পরে তাহাকে উহা খাইতে দিলেন। বালক মরিনুদ্দীন নির্ব্বিকার

চিত্তে উহা খাইয়া ফেলিলেন। খৈল খাইবা মাত্রই বালকের হৃদয়ে সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তখন তিনি স্থির সম্পত্তি যাহা ছিল, সমুদয় বিক্রয় করিয়া, যাহা হস্তগত হইল, তাহা ফকিরদিগকে দান করিয়া, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, তিনি একাদিক্রমে বিংশতি বৎসর কাল সমরখন্দ, বোখারা, খোরাসান, ইস্তারাবাদ, ইস্পাহান, বোগদাদ প্রভৃতি মধ্য এসিয়ার তৎকাল প্রসিদ্ধ স্থান সকল পরিভ্রমণ করিলেন। সে সমস্ত স্থানে ফকির ও দর[illegible]দিগের সহবাসে থাকিয়া, প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিলেন। অবশেষে তিনি নিজেও একজন বুজরুক (জ্ঞানী) ও খাজা (পবিত্র লোক) বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। এই সময়েই তিনি খাজা মৈনুদ্দীন নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার দীক্ষা সম্বন্ধে তিনি স্বপ্রণীত "আনিস্ উল্ আরওয়া" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

"হারুণ পরিত্যাগ করিয়া, আমি বোগ্‌দাদে উপস্থিত হইলাম। তথায় কোন প্রকৃত ফকির আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায়, বোগ্‌দাদ বাসী খাজা ওসমান হারুণী নামক জনৈক ফকিরের যথেষ্ট প্রসংশা করিয়া, তাঁহাকেই সর্ব্ব প্রথম ফকির বলিয়া ব্যাখা করিল। আমি এই কথা শুনিয়া, তাঁহার গৃহ অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিলাম, তিনি সান্ধ্য নেমাজ পড়িবার জন্য মস্‌জিদে গিয়াছেন। আমি মসজিদে যাইয়া, তাঁহার সাক্ষাৎ

কার লাভে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। আমি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন "হে ঈশ্বর তুমি ইহাকে তোমার দাস বলিয়া গ্রহণ কর।" ও আমাকে "আলহাম দেলেল্লা" ও "সোভান আল্লা" এই মন্ত্র দ্বয় সহস্রবার জপ করিতে আদেশ করিলেন। তৎপর তাঁহার টুপি আমার মস্তকে পরাইয়াদিয়া, বলিলেন—তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলে নিষ্ঠাবান হইয়া, এক দিবস ও এক রাত্রি ঈশ্বরোপাসনায় যাপন করিতে হয়। তাঁহার এই সমস্ত আদেশ যথাযথ পালন করিয়া, পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি আমাকে বসিতে বলিয়া, আশমানের দিকে তাকাইতে বলিলেন। আমি তদ্রূপ করিলে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু দেখিতে পাইলে কি ?" আমি বলিলাম "পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থ সমস্ত পর্দ্দা * আমার নিকট খুলিয়া গিয়াছে, আমি সমস্তই দেখিতে পাইতেছি।" তিনি পুনরায় আমাকে চক্ষু বন্ধ করিয়া পরক্ষণেই খুলিতে আদেশ করিলেন এবং দুটী অঙ্গুলী উত্তোলন করিয়া বলিলেন " এই দুই অঙ্গুলীর মধ্যে কি

---

* মুসলমানদিগের বিশ্বাস পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে ৭টী স্তর আছে। ইহার প্রত্যেকটীর অবস্থা ও অবস্থান অন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হিন্দুদিগের সপ্ত স্বর্গের বিশ্বাস ও প্রায় এইরূপ।

কি দেখিতেছ ?” আমি উত্তর করিলাম “জাম্ জাহানুমা †
(জাম—পেয়ালা, জাহানুমা—পৃথিবীর অবস্থা) অর্থাৎ পৃথিবীর
যাবতীয় বর্ত্তমান অবস্থা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি।” এই
কথা শুনিয়া, তিনি বলিলেন “তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে ;
এই বলিয়া তিনি যে বস্ত্রের উপর বসিয়া নেমাজ পড়িতেন,
তাহার নীচ হইতে কিছু পয়সা লইয়া, আমাকে ফকির
দিগকে দান করিতে বলিলেন।”

কিছুদিন বোগদাদে অবস্থিতি করিয়াই, খাজা মরিনুদ্দিন
গুরু সমভিব্যাহারে মক্কায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত
হইয়া, তাঁহার গুরু “কাবার” সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, এই
বলিয়া প্রার্থনা করিলেন “হে মহম্মদ! তুমি আমার প্রিয়
মরিনুদ্দীনকে আমাকে দিয়াছ, এক্ষণে তুমিই তাহাকে গ্রহণ
কর।” দৈববানী হইল “তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করিলাম”।
মক্কায় কিছুদিন অবস্থানের পর, তাঁহারা দুইজনে পুনরায়
মদিনায় গমন করিলেন। কথিত আছে, তথায় উপস্থিত হইয়া,
মরিনুদ্দীন মহম্মদের সমাধি সম্মুখে তাঁহার উদ্দেশে “আস্‌সেলাম
আলিকোম্” বলিবামাত্র, তাঁহার সমাধি হইতেও “আলিকোম

---

† কথিত আছে অতি পূর্ব্ব-কালে মধ্য এসিয়ার কোন স্থানে “জামে
সায়েদ” নামে একজন বাদসাহ ছিলেন। তাঁহার একটী যাদুগুণ-সম্পন্ন
বাটী ছিল। তাহাতে কিঞ্চিৎ সুরা ঢালিয়া দিয়া দেখিলে, জগতের সমস্ত
অবস্থা বর্ত্তমানের ন্যায় দেখা যাইত। ইহারই নাম হইতে সম্ভবত:
“জামে নুজাহামা” কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

সলাম" এই প্রতি সেলামের শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং দৈববাণী হইল "হে মযিনুদ্দীন, তুমিই ধন্য, তুমিই প্রকৃত ফকির ও পণ্ডিতের অগ্রগণ্য।" তাঁহার বিংশতি বর্ষ ব্যাপী ভ্রমণ কালে, তিনি সম্পূর্ণ ভোগ বিলাস শূন্য হইয়া, দিন কাটাইতেন। তিনি যেস্থানে যাইতেন, সেস্থানেই তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িত ও অধিবাসীগণ দলে দলে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিত। এইজন্য তিনি দীর্ঘকাল কোথাও অবস্থান করিতেন না। তিনি রাত্রিকালে সমাধিক্ষেত্রে অথবা ফকিরের আশ্রমে অবস্থান ও দিবাভাগে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি প্রতিদিন দুইবার কোরাণ পাঠ সমাপ্ত করিতেন। সান্ধ্য নেমাজের পর আর নিদ্রা যাইতেন না; সমস্ত রাত্রি একাসনে বসিয়া, ঈশ্বরোপাসনা করিতেন ও পর দিবস প্রাতঃকালীন নেমাজ শেষ করিয়া, আসন পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার আহার ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তিনি সাতদিন অন্তর ১৭ মাসা যবের রুটী কিঞ্চিত জলে ভিজাইয়া আহার করিতেন, এবং সর্ব্বদাই নিজহস্তে "বখেয়া" (সেলাই) করা দুই পুরু কাপড় পরিচ্ছদ করিতেন। পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া গেলে, যেখানে যে কোন আকার ও বর্ণের নেকড়া পাইতেন, তাহাদ্বারাই মেরামত করিয়া লইতেন।

১। মযিনুদ্দীন নানা দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে, হিরাতে আসিয়া উপস্থিত। কিছুদিন তথায় অব-

স্থিতির পর সাজাওয়ার নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় মহম্মদ ইয়াদগার নামে একজন ধনাঢ্য দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী মুসলমান বাস করিতেন। নিজ গ্রামে তাঁহার ক্ষমতা অতুল অপ্রতিহত। কারণ তথায় তিনিই রক্ষক, তিনিই ভক্ষক। তিনি স্বয়ং গ্রামের বিচারপতি ছিলেন। মহম্মদ ইয়াদগার "রাবজী" সম্প্রদায় ভুক্ত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার এরূপ বিদ্বেষ ভাব ছিল যে, সে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক দেখিলেই, তিনি তাহাদের প্রতি আসুরিক অত্যাচার প্রকাশ করিতেন। এমন কি, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে হত্যাও করিতেন। তদ্ভিন্ন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। গ্রামের প্রান্তভাগে তাঁহার একটী উদ্যান ছিল। ঘটনাক্রমে খাজা মহিনুদ্দীন একদিন তাঁহার উদ্যানে উপস্থিত হইয়া, উদ্যান সরোবর তীরে উপবেশন করিলেন। উদ্যান রক্ষক আসিয়া, স্বীয় প্রভুর নাম করিয়া, তাঁহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া, তাহাকে সম্মুখ হইতে দূর হইতে বলিলেন। সে তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া, বিনা দ্বিরুক্তিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। ইহার অনতিপরেই উদ্যান স্বামী স্বয়ং বায়ু সেবনার্থে সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত। তিনি তথায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের একজন ফকিরকে দেখিয়া, ক্রোধে ভৃত্যাদিগকে অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহিনুদ্দীন

এতক্ষণ ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এই গোলযোগে চক্ষু মেলিয়া, ইয়াদগারের দিকে চাহিলেন। উভয়ের দৃষ্টি পরস্পর সম্মিলিত হইলে, ইয়াদগার ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার ভৃত্যবর্গ এই ঘটনায় ভীত হইয়া, তাহাদের প্রভুকে মার্জ্জনা করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে কহিলেন "সরোবর হইতে জল আনিয়া বিস্মোল্লা বলিয়া উহার মুখে সিঞ্চন কর।" এরূপ করা মাত্র ইয়াদগার চেতনা প্রাপ্ত হইয়া, মহিনুদ্দীনের পদতলে পড়িয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও স্বধর্ম্ম ত্যাগে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি ইয়াদগারের মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন "মহম্মদের প্রিয় শিষ্য * দিগের সকলকেই সম্মান করিবে। অথচ তাঁহা-

---

* আবুবকর, ফরিদুদ্দীন, ওসমান ও আলি এই চারিজন মহম্মদের প্রধান শিষ্য ও প্রতিনিধি। তিনি মৃত্যুকালে ইঁহাদের হস্তে ধর্ম্ম প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া যান। আলি মহম্মদের জামাতা। ইঁহাদের প্রথম তিন জন হইতে "সুন্নী" সম্প্রদায় ও আলি হইতে "শিয়া" সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। রাফজী শিয়া সম্প্রদায়ের নামান্তর মাত্র। ইঁহারা আলিকেই মহম্মদের প্রকৃত শিষ্য বলিয়া স্বীকার করেন ও তৎপুত্র হাসন, হোসেনের মৃত্যুপলক্ষে প্রকাশ্য রূপে শোক প্রকাশ ও তাজিয়া নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু সুন্নী সম্প্রদায় আবুবকর প্রমুখ ব্যক্তিত্রয়কে মহম্মদের আজ্ঞা প্রাপ্ত প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করে ও হাসন হোসেনের মৃত্যুপলক্ষে প্রকাশ্য শোক-প্রকাশ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বিবেচনা করে।

দের সকলের আদেশানুসারে চলিবে না।" এই কথা বলিয়া, তিনি কোরাণের এক স্থান পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিরস প্রবাহী পাঠ শ্রবণ করিয়া, ইয়াদগারের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি সানুচর কাঁদিতে কাঁদিতে, আবার খাজা সাহেবের পদতলে পতিত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাকে ফকিরের ধর্ম কি, বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন "তুমি অত্যাচার ও বলপূর্ব্বক যে সমস্ত ধন ও বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছ, তাহা এখনই তাহার প্রকৃত অধিকারীদিগকে ফিরাইয়া দাও।" ইয়াদগার তৎক্ষণাৎ তাহা করিয়া, অবশিষ্ট ধনরাশি ফকির-দিগকে দান করিয়া মইনুদ্দীনের অনুসরণ করিলেন। ঈশ্বর এই উপায়েই তাঁহার প্রিয়সন্তানগণ দ্বারা পাষণ্ডদলন ও প্রবলের হস্ত হইতে, তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

২। ভ্রমণ করা মইনুদ্দীনের এক প্রকার অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। একদা তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে এক অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন সাত জন "আতস্ পরস্ত্" * (অগ্নি উপাসক) তথায় এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া, অগ্নি উপাসনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা ছয় মাস যাবত অনাহারে ও অনিদ্রায়

---

* সম্ভবতঃ ইহারা মুসলমান ভয়ে পলায়িত পার্শী দস্যুর হইবে। ২য় খণ্ডে বঙ্গের বিবরণে পার্শীদের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এই তপস্যা করিতেছিলেন। মহিনুদ্দীন এই ব্যাপার দেখিয়া, ব্যাকুল চিত্তে বলিলেন "তোমরা কি জন্য অগ্নির উপাসনা করিতেছ?" তাঁহারা উত্তর করিলেন "অন্তিম কালে অগ্নি যাহাতে আমাদিগকে দগ্ধ করিতে না পারে, আমরা তৎজন্যই তাঁহার উপাসনা করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া, মহিনুদ্দীন বলিলেন "স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন তৎসৃষ্ট অন্য কোন বস্তু তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সর্ব্বস্রষ্টা এক মাত্র ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার সৃষ্ট জড়-পদার্থের সেবা করিয়া, তোমরা কি পরিত্রাণ পাইবা মনে করিয়াছ?" ইহা শুনিবা মাত্র, অগ্নি উপাসকগণ বলিলেন "তোমার ঈশ্বর কি তোমাকে সর্ব্বভূক অগ্নির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন? তুমি আমাদের সম্মুখে অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিয়া প্রমাণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে, আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না।" তখন মহিনুদ্দীন সগর্ব্বে উত্তর করিলেন "তোমাদের উপাস্য অগ্নি আমার হস্তকে দগ্ধ করিবে দূরের কথা, আমার পাদুকাও দগ্ধ করিতে সমর্থ নহে।" এই বলিয়া তিনি একখান পাদুকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করা মাত্র অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। আতসপরস্তগণও বিস্মিত হইয়া, জড়োপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

৩। কথিত আছে একদিন মহিনুদ্দীন সেখ আলি নামে জনৈক শিষ্য সমভিব্যাহারে, বাজার দিয়া গমন করিতে-

ছিলেন। এক দোকানদারের আলির নিকট টাকা পাওনা ছিল। দোকানদার হঠাৎ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া, টাকার জন্য তাহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল ও টাকা না পাইলে তাহাকে সর্ব্বজন সমক্ষে অপমানিত করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। মারিনুদ্দীন এই ব্যাপার দেখিয়া, দোকানদারকে আরও দুই চারিদিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। দোকানদার ক্রোধ ও ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিল "তোমার আর মধ্যস্থতা করিবার প্রয়োজন নাই, যদি ক্ষমতা থাকে, নিজ হইতে টাকা শোধ করিয়া তোমার বন্ধুকে লইয়া চলিয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া, মরিনুদ্দীন আপনার উত্তরীয় বস্ত্র পথি মধ্যে বিস্তার করিয়া, বলিলেন "তোমার যাহা প্রাপ্য লইয়া যাও। তাহার অধিক লইলে অনুতাপ করিতে হইবে।" দোকানদার দেখিল উত্তরীয় বস্ত্র মুদ্রায় পরিপূর্ণ; সে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া টাকা লইবে, এই আশায় যেমন হস্ত প্রসারণ করিল, অমনি তাহার হস্ত শুষ্ক হইয়া গেল। দোকানদার তখন মরিনুদ্দীনের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। তিনি হাঁসিতে হাঁসিতে তাহার হস্তে হস্ত বুলাইয়া, তাহাকে প্রকৃতস্থ করিলেন।

৪। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, আহারীয় দ্রব্যের সংস্থান না থাকিলে, ভৃত্যগণ জানাইবা মাত্র, তিনি "মসেল্লার" (যে বস্ত্রোপরি উপবেশন করিয়া, মুসলমানগণ নেমাজ পড়িয়া

থাকে) নীচ হইতে, আবশ্যকীয় দ্রব্য বাহির ক... দিতেন। কিন্তু কোথা হইতে সে সমস্ত আসিত, কেহই বুঝিতে পারিত না। খাজা মরিনুদ্দীন সম্বন্ধে এরূপ আরও অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

খাজা মরিনুদ্দীন মক্কা হইতে মদিনায় উপস্থিত হইলে, মহম্মদের কবর হইতে আদেশ হইল "হে মরিনুদ্দীন তুমি আজমীরে যাইয়া, তথাকার কাফেরদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত কর।" মরিনুদ্দীন এরূপ আদিষ্ট হইয়া, ৫২ বৎসর বয়ক্রম কালে আজমীরে উপস্থিত হইলেন এবং খাজা সাহেবের দরগার যে স্থানে "খাজ্জারা মসজিদ্" প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানে বিশ্রাম লইলেন। সেস্থান হইতে আনা সাগরের তীরস্থ এক শৈলোপরি যাইয়া, অবস্থান করিলেন। আনা সাগরের তীরে কতকগুলি দেবমুর্ত্তি ছিল। মুসলমানগণ সে স্থানে পশু হত্যা করাতে, নগরবাসী তাহাদিগকে হত্যা করিবার মানসে ষড়যন্ত্র করিল। নগরবাসী মুসলমানদিগের বিনাশ সাধন জন্য তথায় উপস্থিত হইলে, তাহারা একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না; মন্ত্রমুগ্ধবৎ এক এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। তখন তাহারা ভীত হইয়া "রাম, রাম" উচ্চারণ করা মাত্র, তাহাদের মুখ হইতে "রহিম, রহিম" শব্দ বাহির হইতে লাগিল। তৎপর তাহারা যাদুকর অজয়পাল ও দেবতা সদিদেওর সাহায্য গ্রহণে, মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ উদ্যোগ করিয়াও জয়ী হইতে পারিলনা। হিন্দুগণ

উপায়ান্তর না দেখিয়া, খাজা সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহাকে নগরের মধ্যে আসিয়া, অবস্থান করিতে আহ্বান করিল। তিনি বর্ত্তমান দরগায় তাঁহার বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। অজয়পাল ও সদিদেও এই সময় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; কিন্তু আজমীরের তৎসাময়িক চোহান রাজ কিছুতেই এ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তাহাতেই খোরাসানে সাহাবুদ্দীনের প্রতি, কাফের রাজাকে শাস্তিপ্রদান করিতে, খাজা সাহেবের স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল।

খাজা মরিনুদ্দীন দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণের বংশধরেরা "দেওয়ানজী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহারাই এখন বর্ত্তমান দরগার এক মাত্র অধিকারী। খাজা সাহেবের বংশধরগণ ভারতের সর্ব্বত্র অত্যন্ত সম্মানিত। তিনি ১২৩৫ খৃঃ অব্দে ৯৭ বৎসর বয়ক্রম কালে আজমীরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার দেহ খাজা সাহেবের দরগায় সমাধিস্থ হইয়াছে। তৎবিবরণ আজমীর বিবরণে বিশেষ বিবৃত হইয়াছে।

—:•:—

দ্বাদশ অধ্যায়।

দিল্লী।

ইন্দ্রপ্রস্থ বা পুরাণ কিল্লা—পাঠান দিল্লী—সাজাহানাবাদ।

১৮৮১ খৃঃ অব্দের ১লা অক্টোবর আমি কয়েকটী বন্ধুর সহিত দিল্লী দর্শনার্থে আজমীর পরিত্যাগ করিলাম। রাত্রিতে গাড়ী চাপিয়া, তৎপর দিবস (২রা অক্টোবর) রাত্রিতে আসিয়া, দিল্লীতে পৌঁছিলাম। গাড়ী ষ্টেসনে পৌঁছিবা মাত্রই, আমরা চাঁদনী চকে আমাদের একজন পরিচিত বাঙ্গালী বাবুর বাসায় চলিয়া গেলাম। তাঁহার নাম হে——বাবু, তথাকার একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার। তিনি আমাদিগকে খুব যত্ন ও আদর করিতে লাগিলেন। ২রা অক্টোবর সপ্তমী পূজা। সে দেশে দুর্গাপূজার নাম গন্ধও নাই। দিল্লীর বাঙ্গালী বাবুগণ তথায় একখানা কালী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। পূজার কয় দিবস বাবুগণ সেই কালীর বাড়ীতেই উৎসব করিয়া, কতকটা বঙ্গীয় শারদীয় আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। কালীর বাড়ীতে বাইএর গান হইবে। আমাদের আহার সমাপনের পরই, হে——বাবু তথায় যাইয়া, গান

শুনিবার জন্য আমাদিগকে অত্যন্ত অনুরোধ করিলেন। আমরা ও তাঁহার গাড়ীতে কালী বাড়ী যাইয়া, দিল্লীর বাইএর গান শুনিয়া খুব তৃপ্ত হইলাম। মন্দিরে কালীমূর্ত্তি পুষ্পদলে সুশোভিত; পুরোহিত ঠাকুর সম্মুখে একখানা আসনে উপবিষ্ট। বাইজী দর্শনে পুরোহিতজী কালীজীর নিকট পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন। এখন বিগ্রহের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া, বাইজীর গান শ্রবণে রত। কেবল মাঝে মাঝে প্রণামীর টাকা পতন শব্দ তাঁহার মোহ ভাঙ্গিয়া দিতেছে। সম্মুখ প্রাঙ্গণেই বাইজী খাসপাশী গজল গাইয়া, শ্রোতাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছেন; আর একটী "বাহাবা" পড়া মাত্র অবনত মস্তকে, শ্রোতাদিগকে বার বার সেলাম বাজাইয়া, নম্রতা প্রদর্শন করিতেছেন। বাইজীর দুইপার্শ্বে দুইজন মশাল ধারী। সফরদারগণ চোস্ত পায়জামা ও চাপকান পরিধানে, কোমরে বায়া তবল ও সারঙ্গ বাঁধিয়া, বাইজীর গতি বিধির সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার পুচ্ছধারী কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় ঘুরিতেছে ও ফিরিতেছে। গান শুনিয়া "অনুমানেন বোধব্যং" হইল, সঙ্গীত শাস্ত্রে বাইজীর বেশ ব্যুৎপত্তি। গানের ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অথচ আয়দব কায়দাও দেখাইতে হইবে। কেবল শ্রোতাদিগের বাহাবার সঙ্গে সঙ্গে ডিটো (Ditto) দিয়া, বাইজীকে অনুগৃহীত করিলাম। গত দুই রাত্রি ট্রেণে ভাল ঘুম হয় নাই। দুই তিন ঘণ্টা গান শুনিয়াই, আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

দিল্লীতে আমাদিগকে অল্প দিন মাত্র থাকিতে হইবে। এই কয়েক দিবসেই আমরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া, দিল্লীর দ্রষ্টব্য বিষয় গুলি দেখিয়া লইলাম। দিল্লী জগত ইতিহাসের একটী উচ্চতম অভিনয় ক্ষেত্র। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থ সংস্থাপনের পর হইতেই, এক্ষেত্রে কত নরপতি জন্ম গ্রহণ করিয়া, কালের শাসনে লয় পাইয়া গেলেন। এস্থানে কত বংশ পরম্পরায়, এক বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, অন্য বংশ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এস্থানের নিকটেই এক সময়ে সমগ্র ভারত অবনত মস্তকে অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। আবার একদিন এস্থানেই ভারতের স্বাধীনতা-রত্ন বিধর্ম্মী বিদেশী যবনের করে সমর্পিত হইয়াছে। এস্থানেই ধর্ম্ম রাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভারতের নৃপতি-বৃন্দ উপস্থিত হইয়া, মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে সার্ব্বভৌম নৃপতি স্বীকার করিয়া, করদানে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এস্থানেই পৃথ্বীরাজ ভারতের অন্যান্য নৃপতি বৃন্দকে করতলস্থ করিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন। এস্থানেই আবার ইংলণ্ডেশ্বরী অন্য প্রকৃতিতে "ভারত রাজ-রাজেশ্বরী" (Empress of India) উপাধি গ্রহণ মানসে, সমুদয় ভারত নৃপতিবর্গকে দরবারে আহ্বান করিয়া জানাইলেন, সমগ্র ভারত এখন তাঁহার পদতলে উৎসর্গীকৃত। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকাল হইতে এই দিল্লীতে যেরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির রাজকার্য্য অভিনীত হইয়া গিয়াছে; এস্থানে

যেরূপ ঐশ্বর্য্য মত্ততার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে; এস্থানে মানব চরিত্র শোক দুঃখের, সুখ সৌভাগ্যের অভিনয় করিয়া জগতকে যেরূপ স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিয়াছে; জগতের আর কোন স্থানেই সেরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। এক দিন রোম জ্ঞাত ভূভাগকে কম্পিত করিয়াছিল; একদিন কার্থেজ বড় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল; একদিন পেরিশ সমস্ত ইয়োরোপকে কম্পিত করিয়াছিল; এক সময়ে রোম বলিয়াছিল আমিই জগতের রাজরাণী, একদিন ইরাণের বল বিক্রমে প্রাচীন গ্রীশ পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিল; কিন্তু এ প্রাচীন ভারতের প্রাচীন দিল্লীর সমকক্ষ হইয়া, তাহার কোন স্থানটী দাঁড়াইতে সক্ষম? আমরা সে দিল্লীর বর্ত্তমান বিবরণ পাঠকবর্গকে জানাইবার পূর্ব্বে তাহার একটী অতি সংক্ষেপ ইতিহাস জানাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইন্দ্রপ্রস্থ সংস্থাপনের পর যুধিষ্ঠির * ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র

---

* যুধিষ্ঠির কোন সময়ে আবির্ভূত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা বড় সুকঠিন। তবে বেণ্টলি (Bentley) নামক জনৈক লোক নক্ষত্রের গণনা দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মহাভারতে একটী গ্রহের যেরূপ অবস্থান বার্ত্তা লিখিত আছে, সেই গ্রহটীর তদ্রূপ অবস্থান খৃষ্টীয় ১৪২০ শতাব্দী পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে "সপ্তর্ষি যখন মঘাতে অবস্থান করে, সে সময় পরীক্ষিতের জন্ম হয় ও তাহারা পূর্ব্ব আষাঢ়ে গমন করিলে পর, নন্দ রাজা হইবেন। নন্দের সময় খৃষ্টের পঞ্চ শতাব্দী পূর্ব্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সপ্তর্ষি

পরীক্ষিৎ হইতে আরম্ভ করিয়া, মহারাজা ক্ষেমক পর্য্যন্ত দিল্লী ৩০ জন পাণ্ডুবংশীয় নৃপতি কর্ত্তৃক শাসিত হয়। রাজকার্য্যে অদক্ষ বলিয়াই, মহারাজা ক্ষেমক তদীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলেন। এস্থানেই মহারাজা যুধিষ্ঠিরের বংশ বিলুপ্ত হইয়া, মহারাজা বিসর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, মহারাজা মদপাল পর্য্যন্ত ১৪ জন তক্ষক বংশীয় নৃপতি কর্ত্তৃক ৫০০ বৎসর কাল ইন্দ্রপ্রস্থ শাসিত হইল। মহারাজা ক্ষেমকের ন্যায় মহারাজা মদপাল ও তদীয় মন্ত্রীর হস্তে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তৎপর ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন গৌতম বংশীয় নৃপতি বৃন্দের হস্তগত হইল। মহারাজা মহারাজি হইতে আরম্ভ করিয়া, মহারাজা অন্তিন পর্য্যন্ত ১৫ জন গৌতম বংশীয় নৃপতি ইন্দ্রপ্রস্থ শাসন করিয়াছিলেন। মহারাজা অন্তিন রাজ্য শাসনে বীতস্পৃহ হইয়া, তদীয় সমর সচিবের হস্তে রাজকার্য্য ভার অর্পণ করিলেন। তৎপর মৌর্য্যবংশীয় মহারাজা ধুন্দসেন হইতে আরম্ভ করিয়া,

এক নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্রে ১০০ বৎসরে অতিক্রম করে। সপ্তর্ষির মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ় অতিক্রম করিতে ১০০০ বৎসরের আবশ্যক। ইহাতেও যুধিষ্ঠিরের সময় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ব্বে বলিয়াই অনুমিত হয়। আবার ভাগবত পুরাণে নন্দ ও পরীক্ষিতের মধ্যবর্ত্তী সময় ১১১৫ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নন্দ বংশ ন্যূনাধিক ১০০ বৎসর রাজত্ব করিলে পর, খৃষ্টীয় শকের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহাতেও পরীক্ষিতের সময় খৃষ্টীয় শকের ১৫৩০ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

রাজপাল পর্য্যন্ত ৯জন রাজা ইন্দ্রপ্রস্থ শাসন করিয়াছেন। মহারাজা রাজপাল কমায়ুন-রাজ সুখবন্তের(অন্যনাম শকাদিত্য) রাজ্য আক্রমণ করিতে যাইয়া যুদ্ধে নিহত হইলেন। সুখবন্তও এই অবসরে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। এ সময়েই বিক্রমাদিত্যের বিক্রম-শীল অভ্যুত্থান। তিনি সুখবন্তকে পরাভূত করিয়া, ভারতের রাজধানী উজ্জয়িনীতে লইয়া গেলেন। সে সময় ভারত-রাজ-পাট দিল্লী পরিত্যাগ করিয়, ৮০০ বৎসর কাল উজ্জয়িনীতে বিরাজ করিল। এই আটশত বৎসরেই প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের শোভা সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বিধ্বংশ হইয়া গিয়াছে।

৭৯২ খৃঃঅব্দে তুয়ার বংশীয় ১ম অনঙ্গ পাল * আসিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের ৫ মাইল ব্যবধান পুরাতন দিল্লীতে রাজপাট স্থাপন করিলেন। অনেকে বলেন এই অনঙ্গ পাল হইতেই দিল্লী নামের সৃষ্টি। কেহ বলেন মৌর্য্য বংশীয় শেষ রাজা রাজ পালের অন্য নাম 'দিলু' ছিল; তাঁহা হইতেই দিল্লী নাম সৃষ্ট হইয়াছে। দিল্লী নামের সৃষ্টি সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ আছে। পুরাতন দিল্লীর লৌহস্তম্ভ বর্ণনা কালে আমরা তাহা পাঠক বর্গকে জানাইব।

---

* অনঙ্গ পালের অন্যনাম ঠাকুর বলবান দেব। তিনি যুধিষ্ঠিরের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত। তাঁহার রাজত্ব কালে কনোজে রাঠোরগণ অত্যন্ত সমৃদ্ধি সম্পন্ন হওয়াতে, দিল্লী বিশেষ সমৃদ্ধ হইতে পারে নাই।

প্রথম অনঙ্গ পাল হইতে ১৪ জন নৃপতির পর দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাঠোর প্রভাবে দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পূর্ব্বে দিল্লীর বড় হীনদশা ছিল। কিন্তু তাঁহার সময় হইতেই দিল্লীর শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তিন জন রাজা দিল্লীতে রাজত্ব করিলে, তৃতীয় অনঙ্গপাল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি নিঃসন্তান বলিয়া, তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই নিজ দৌহিত্র আজমীরের চোহান রাজকুমার পৃথ্বীরাজকে * উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। অনঙ্গ পালের মৃত্যুর পরই পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

পৃথ্বীরাজের সময়ই ভারতে মহম্মদ ঘোরীর অভিযান। দৃষবতী তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত মুসলমানগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া, তদীয় জীবন-সূর্য্য সহ ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইল। তৎপর ভারত সাম্রাজ্য মুসলমান হস্তে পতিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে একজন ঘোরী বংশীয়, দশজন দাস রাজ, তিন জন খিলজী বংশীয়, দশজন তোগলক বংশীয়, একজন লোদী বংশীয়, চারিজন সৈয়দ বংশীয়, তিনজন লোদী বংশীয়, দুইজন মোগল বংশীয়, তিনজন শুর বংশীয় ও ১৬জন মোগল বংশীয় সম্রাট কর্ত্তৃক বংশ পরম্পরায় শাসিত হইয়াছে। অবশেষে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ রাজ

* আজমীরের বিবরণে দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের ক্রীড়া পুত্তলি বাহাদুর সাহার নিকট হইতে দিল্লীর রাজ ভবনটী পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত করিলেন। মুসলমান রাজত্ব অথবা ইংরেজ রাজত্বের দিল্লী ঘটনাবলী আমরা বিবৃত করিলাম না। ইতিহাস পৃষ্ঠে তাহা সুস্পষ্ট চিত্রিত রহিয়াছে।

—:০:—

ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লীর হিন্দুরাজ বংশ তালিকা।

পাণ্ডববংশ।

(১) যুধিষ্ঠির, (২) পরীক্ষিৎ, (৩) জনমেজয়, (৪) শতানীক, (৫) সহস্রানীক, (৬) অশ্বমেধজ, (৭) অসীম কৃষ্ণ, (৮) নেমীচক্র, (৯) উপ্ত, (১০) চিত্ররথ, (১১) শুচিরথ, (১২) বৃষ্টিমান, (১৩) সুসেন, (১৪) সুনীথ, (১৫) নৃচক্ষু, (১৬) সুখীনল, (১৭) পুরিপ্লব, (১৮) সুনয়, (১৯) মেধাবী, (২০) নৃপঞ্জয়, (২১) দুর্ব্ব, (২২) তিমি, (২৩) বৃহদ্রথ, (২৪) সুদাস, (২৫) শতানীক (২য়), (২৬) দুর্দ্দমন, (২৭) মহীনর, (২৮) দণ্ডপানি, (২৯) নিমি, (৩০) ক্ষেমক।

—:০:—

তক্ষক বংশ।

(১) বিসর্ব্ব, (২) সুখ্বণ, (৩) শীর্য্য, (৪) অহংশাল, (৫) বংজিত, (৬) দুর্ব্বার, (৭) সদাপাল, (৮) সুরসেন, (৯) সিংহরাজ, (১০) অমবাদ, (১১) অমরপাল, (১২) সর্ব্বদি, (১৩) পদারৎ, (১৪) মদপাল।

—:০:—

গৌতম বংশ।

(১) মহারাজি, (২) শ্রীসেন, (৩) মহীপাল, (৪) মহাবলী, (৫) শ্রুপবর্ত্তী, (৬) নেত্রসেন, (৭) সুমুখ, (৮) জিতমল, (৯) কলঙ্ক, (১০) কুলমান, (১১) শ্রীমর্দ্দন, (১২) জয়বক্ক, (১৩) হরগুজ, (১৪) হীরক সেন, (১৫) অস্তিন।

মৌর্য্যবংশ।

(১) ধুদসেন, (২) সিদ্ধরাজ, (৩) মহাগঙ্গ, (৪) নন্দ, (৫) জীবন, (৬) উদয়, (৭) জীহুল, (৮) আনন্দ, (৯) রাজ-পাল।

—:০:—

কমায়ুন রাজবংশ।

(১) সুখবন্ত। (বিক্রমাদিত্য সুখবন্তকে নিহত করিয়া রাজধানী উজ্জয়িনীতে লইয়া যান। তথায় প্রায় ৮০০ বৎসর রাজধানী অবস্থানের পর, তুয়ার বংশ আবার রাজপাট দিল্লীতে স্থাপন করে।

—:০:—

তুয়ার বংশ।

(১) বলবান দেব বা অনঙ্গ পাল (১ম), তৎপর ১২ জন নৃপতি। (১৪) কুমার পাল, (১৫) অনঙ্গপাল (২য়), তৎপর ৩ জন নৃপতি। (১৯) অনঙ্গপাল (৩য়)।

—:০:—

চোহান বংশ।

(১) পৃথ্বীরাজ।

ইহার পর হইতেই মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ।

—:০:—

ইন্দ্রপ্রস্থ বা পুরাণ কিল্লা।

৪ঠা অক্টোবর। ইন্দ্রপ্রস্থ † বা পুরাণ কিল্লা বর্ত্তমান দিল্লী সহরের প্রায় আড়াই মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে যমুনা তীরে অবস্থিত। ইন্দ্রপ্রস্থে হিন্দু রাজত্বের সমসাময়িক কোন চিহ্নই আমরা দেখিতে পাইলাম না *। উজ্জয়িনী অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য কমায়ুন-রাজ সুখবন্তকে পরাজয় করিয়া, রাজপাট উজ্জয়িনীতে লইয়া যাওয়াতে যে, ৮০০ বৎসর কাল রাজধানী দিল্লী হইতে দূরে অবস্থান করিয়াছিল, তাহাতেই ইন্দ্রপ্রস্থের শোভা সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বিধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। হুমায়ুন্ এ স্থানের ইন্দ্রপ্রস্থ অথবা পুরাণ কিল্লা নাম লোপ করিয়া, দিনপান্না (ধর্ম্মাবাস) নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পলায়নের পর, শের সাহার সময় উহা আবার "শেরগড়" নামে অভিহিত হইল। সেই উভয় নাম উহ্য থাকিয়া, এখন আবার ইন্দ্রপ্রস্থ অথবা পুরাণ কিল্লা নামেই এ স্থান

---

† ইন্দ্রপ্রস্থের অন্যনাম ইন্দ্রপথ। কুরুক্ষেত্র সমরের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট যে পঞ্চপ্রস্থ বা পঞ্চপথ চাহিয়া ছিলেন, ইন্দ্রপ্রস্থ তাহার একটি। তদ্ভিন্ন পানিপথ, শোনপথ, তিলপথ ও ভাগপথ প্রভৃতি অন্যপ্রস্থ চতুষ্টয় ও যমুনার উভয় পার্শ্বের অনতিদূরেই সংস্থাপিত।

* পুরাণ কিল্লার সন্নিকটে যমুনার একটী ঘাটের নাম "নিগম্বড় ঘাট"। অনেকে বলেন যুধিষ্ঠির এ স্থানে স্নান করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন।

অভিহিত হইতেছে। পুরাণ কিল্লার চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। প্রাচীর বহির্ভাগে পূর্ব্বে যে পরিখা ছিল তাহা এখন অদৃশ্য প্রায়। পূর্ব্বে ইহাতে কতটী তোরণ ছিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু এখন উহার একটী মাত্র জীবিত থাকিয়া, তোরণের পরিচয় দিতেছে। পুরাণ কিল্লার অন্তর্গত দৃশ্য রাজীর মধ্যে "কিলা কিনা মস্‌জিদ"ও"শের মুঞ্জিলই প্রধান।" 'কিলা কিনা' ভগ্নবেশে থাকিলেও একটী মনোহর দৃশ্য। হুমায়ুন সাম্রাজ্য লাভ করিয়াই ইহা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। পরে শের সাহা কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, পলায়ন পর হইলে, শের সাহা উহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। শের সাহা ফিরোজাবাদের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া, পুরাণ কিল্লার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া, উহার নাম "দিল্লী শের সাহী" রাখিয়াছিলেন।

শের মুঞ্জিল—শের সাহার রাজ ভবন। ইহা একটী রক্ত প্রস্তরের ত্রিতল হর্ম্ম্য, শের সাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। হুমায়ুনের পুনঃ রাজ্য প্রাপ্তির পর তিনি এই মন্দিরে আপন পুস্তকাগার (Library) স্থাপন করিলেন। এই মন্দিরেই এক দিবস সিঁড়ি হইতে পদস্খলন হইয়া, তিনি ভয়ানক আহত হইয়াছিলেন ও অনতিপরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী, হুমায়ুন ও শের সাহার রাজভবন আজি জর্জ্জরিত কলেবরে

মৃতপ্রায়; যমুনা যাত্রায় (গঙ্গাযাত্রা) আনীত হইয়া যেন, কেবল অন্ত নিশ্বাসের অপেক্ষা করিতেছে।

লাল বাঙ্গালা—পুরাণ কিল্লার অদূরেই অবস্থিত। এ স্থানে রক্ত প্রস্তরের দুটী সমাধি মন্দির আছে। তাহার একটী ১৫৪০ খৃঃ অব্দে সম্রাট হুমায়ুন কর্ত্তৃক তাঁহার এক স্ত্রীর সমাধির উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যটী বাদসাহ সাহ আলমের স্ত্রী লালকাউরের সমাধি'পরি নির্ম্মিত। লালকাউরের নাম হইতেই ইহার নাম "লাল বাঙ্গালা" হইয়াছে।

আরবকী সরাই—একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহাও পুরাণ কিল্লার নিকটেই নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা দুটী মনোহর ফাটকের জন্যই দর্শনীয়। হুমায়ুন পত্নী হাজী বেগম কয়েক জন আরব দেশীয় মোল্লাকে আরব হইতে আনিয়া, এ স্থানে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে স্থানে এখন আরবদিগের নাম গন্ধও নাই।

বেয়লী বা কূপ—নিজামুদ্দীনের সমাধি নিকটে খনিত। ইহা নিজামুদ্দীন খনন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস—এই কূপের জলে স্নান করিলে সমুদয় পীড়া আরোগ্য হয়। তৎজন্য নিজামুদ্দীনের মেলার সময় অনেক যাত্রী এই কূপের জলে স্নান করিয়া থাকে।

সৈয়দ আবিদ সমাধি—নিজামুদ্দীন সমাধি ও পুরাণ কিল্লার মধ্যে নির্ম্মিত। হুমায়ুনের সমাধির বিপরীত দিকে "মসজিদ ইসা খাঁ" নামক আর একটী মন্দির দৃষ্ট হয়।

ইহাকে লোকে "ইসা খাঁর কোতলা" কহিয়া থাকে। ইসা খাঁ শের সাহার দরবারে একজন ওমরাও ছিলেন। নিজাম-মুদ্দীন সমাধির নিকটে আর একটী মসজিদের নাম "জুম্মত খাঁ মসজিদ"। ইহা ফিরোজ সাহা কর্ত্তৃক ১৩৫৩ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আরবকী সরাইর নিকটে আকবরের পালক পিতা আজিম খাঁর (তাঁহার অন্য নাম টোগা খাঁ) সমাধি গৃহ।

নীলভুজ—আরবকী সরাইর নিকটে অবস্থিত। ইহা কোন পাঠান সম্রাট কর্ত্তৃক এক সৈয়দের সমাধি'পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা নীলবর্ণে চিত্রিত ছিল। এখনও গৃহের এক পার্শ্বে সেরূপ চিত্রের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তৎজন্যই ইহার নাম নীলভুজ হইয়াছে। পুরাণ কিল্লার সন্নিকটে "কালা মহল" নামে আর একটী দর্শনীয় গৃহ ছিল। তাহা এখন সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত।

মোকবরা খাঁ খান্না—বিরাম খাঁর পুত্র আবদুল রহিম খাঁ ওরফে খাঁ খান্না কর্ত্তৃক তাঁহার স্ত্রীর সমাধির জন্য নির্ম্মিত। পরিষ্কৃত মার্ব্বল ও রক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত হওয়াতে, এই গৃহটী একটী মনোহর দর্শনীয় বিষয় ছিল। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা খাঁ, ইহার শ্বেত প্রস্তরাদি অপহরণ করিয়া, লক্ষ্ণৌ লইয়া যাওয়াতে, ইহা এখন নিতান্ত কদর্য্য হইয়া রহিয়াছে।

চৌষাট খাম্বা—১৬০০ খৃঃ অব্দে নিজামুদ্দীনে ও হুমা-

য়ুন সমাধির মধ্যভাগে নির্ম্মিত। ইহা শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত হওয়াতে দেখিবার একটী প্রধান বিষয়। গৃহটী চৌষাট্টি স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত বলিয়াই, ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। শ্বেত প্রস্তরের পর্দ্দায় ইহার চতুর্দ্দিক বেষ্টিত ছিল। এখন অনেক স্থানে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গৃহ মধ্যে তোগা খাঁর পুত্র মির্জা আজিজা ককুলতুশ খাঁর সমাধি। এই তভাগ্য যুবকও আদম খাঁর হস্তে নিহত হইয়া পিতার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

দিল্লীর এভাগের প্রধান দৃশ্য মধ্যে গোরস্থানও একটী প্রধান দৃশ্য। ইহা পুরাণ কিল্লার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। গোরস্থানে সম্রাট হুমায়ুন, হতভাগা দারা, জেহেন্দার সাহ, ফিরোকশিয়ার, রাফিউদ্দেরাজিত, রাফিউদ্দৌল্লা, ২য় আলমগির এবং কতিপয় বেগম, সাহাজাদা ও সাহাজাদীদিগের মৃত দেহ সমাধিস্থ রহিয়াছে। হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরই দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহা পরিষ্কৃত শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। পতিব্রতা হামিদাবানু বেগম স্বামীর অপমৃত্যুর পর, তাঁহার স্মরণার্থে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে আরম্ভ করিয়া, ১৬ বৎসরে ইহা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। সমাধি মন্দিরের ভিন্ন প্রকোষ্ঠেই হামিদাবানু বেগম ওরফে হাজি বেগম ও স্বামীর নিকট অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন।

দারার সমাধি মঞ্চটী দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিত ছোট। হতভাগা

রাজকুমার দারা আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক সপুত্র দিল্লীতে আনীত হইয়া, বন্দী হইলেন। পাপাত্মা আরঙ্গজীব ভ্রাতার সংহারার্থে, দারার কয়েক জন ঘোর শত্রুকে নিযুক্ত করিলেন। সে পাপাত্মা-গণই গভীর রাত্রিতে দারার বন্ধন গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার প্রাণ সংহার করিল ও ছিন্ন মুণ্ড একখানা পাত্রে রাখিয়া, আরঙ্গজীব সমীপে উপস্থিত করিল। পাপাত্মা ভ্রাতার ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়া, দুই এককোঁটা চক্ষের জল ত্যাগ করিলেন ও হুমায়ুন সমাধি মন্দিরের নিকট উহা সমাধিস্থ করিতে অনুমতি করিলেন। অনেকে বলেন দারার সমাধি মধ্যে কেবল তাঁহার মস্তক শূন্য দেহটী সমাধিস্থ হইয়াছে বলিয়াই, ইহার দৈর্ঘ্য এত অল্প।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিষ সেনা দিল্লী প্রবেশ করিলে, বিদ্রোহ উদ্যোক্তা বৃদ্ধ বাহাদুর সাহার পুত্রগণ স্বদলে এই সমাধি ক্ষেত্রে পলায়ন করিয়া, আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে ইংরেজ সেনাপতি হডসন সাহেব গুলি করিয়া, তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিলেন। সিপাহী যুদ্ধের সংক্ষেপ বিবরণ আমরা পাঠক বর্গকে পরে জানাইব।

যে গোরস্থানে হুমায়ুনের সমাধি বিরাজিত, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমে গিয়াসপুর নামক স্থানে আর একটী প্রসিদ্ধ গোরস্থান আছে। তথায় নিজামউদ্দীন, কবি খশ্রু, মির্জাজাহাঙ্গীর, জাহানারা বেগম ও মহম্মদ সাহার সমাধিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

নিজামুদ্দীন সমাধি——এই মন্দির ১৩৫০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। নিজামুদ্দীন বাদসাহ টোগলক সাহার সম সাময়িক লোক। এই মন্দিরের বারেন্দা শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়া, দেখিতে অতি সুন্দর। নিজামুদ্দীনের সম্মানার্থে প্রতি বৎসর এই স্থানে একটী মেলা হয়। মন্দিরের মধ্যভাগ কোরাণের বয়ানে চিত্রিত। সমাধি মঞ্চের শিরোভাগে এক-খানা কোরাণ রক্ষিত। আকবর ও সাজাহান বাদসাহের সময় পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হওয়াতে, ইহা আজিও অতি সুন্দর অবস্থায় রহিয়াছে। জেনেরেল স্লিমান (General Sleeman) বলেন, এই নিজামুদ্দীনই ভারতবর্ষের ঠগীদিগের দস্যু-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাহারা ইহাকে দলপতি জ্ঞানে রাশি রাশি অর্থ প্রদান করিত। নিজামুদ্দীনের মৃত্যুর পর ও সেই দস্যুগণ এই মন্দির দর্শনার্থে এই স্থানে আগমন করিয়া, তাহাকে প্রচুর সম্মান করিত।

খশ্রুর সমাধি—নিজামুদ্দীন-সমাধি-মন্দিরের নিকটে অবস্থিত। কবি খশ্রু টোগলক সাহার সমসাময়িক লোক। তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, বাদসাহ তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। ইহা ১৩৫০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হই-য়াছে।

মির্জা জাহাঙ্গীরের সমাধি—প্রস্তরে সুন্দর কারু খচিত। মির্জা জাহাঙ্গীর দ্বিতীয় আকবর সাহার পুত্র। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে এই সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয়। অপরিমিত

মদ্যপানে মির্জ্জা জাহাঙ্গীর অসময়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

জাহানারা বেগমের সমাধি—এই সমাধি মন্দির দর্শন করিলে, দর্শকের মনে এক অভূত পূর্ব্ব ভক্তির উদ্রেক হয়। পাপাত্মা আরঙ্গজীব কর্তৃক দারা নিহত হইলে ও সাজাহান কারাবদ্ধ হইলে, জাহানারা আরঙ্গজীবের অতুল ঐশ্বর্য্যকেও ধিক্কার প্রদান করিয়া, চির-কৌমার্য্য অবলম্বনে, পিতার সহিত কারাবাসে জীবন অতিবাহিত করিলেন। তিনি জীবিতাবস্থায়ই সমাধি'পরে খোদিত করিয়া রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত কথা গুলি লিখিয়া রাখিয়া যান "কোন চন্দ্রাতপে যেন আমার সমাধি আচ্ছাদিত না হয়। এই তৃণ রাশিই আমার গতাত্মার যথেষ্ট আচ্ছাদন।" তদ্ভিন্ন এই সমাধি মঞ্চে "বাদসাহ সাজাহানের কন্যা, চিস্তির পবিত্র ফকিরের শিষ্যানী বিনয়ী পরিবর্ত্তনময়ী জাহানারা" বলিয়া, আরো কয়েকটী কথা লিখিত আছে। ১৬৮০ খৃঃঅব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়।

মহম্মদ সাহার সমাধি—জাহানারা সমাধির নিকটে অবস্থিত। ইহাও দেখিতে অতি সুন্দর। নাদির সাহার আক্রমণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, মহম্মদ সাহা এই সমাধি-গর্ভে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত আছেন। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়।

পাঠক, আমরা ওল্ড্ ফুল্ (Old Fool) দিগকে চিরদিন ঘৃণা করিয়া থাকি। এই ইন্দ্রপ্রস্থ ওল্ড্ ফুল্ অপেক্ষাও

ওল্‌ড্‌ ফুল্‌। ইহা দেখিয়া আমাদের আর কোন আবশ্যক নাই। চলুন এখন আমরা প্রাচীন দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করি। প্রাচীন হইলেও এই বুড়োর পেটে ভারতের অনেক কথা গাঁথা রহিয়াছে। অই দেখুন, বর্ত্তমান দিল্লীর দক্ষিণ প্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখুন—কুতুব মিনারের অভ্রভেদী মূর্ত্তি প্রায় ১১ মাইল দূরে কেমন ধূসর পরিলক্ষিত হইতেছে। অই দেখুন, কুতুব মিনার যেন উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া, মোসাফির (পরিব্রাজক) দিগকে বলিয়া দিতেছে "আমি প্রাচীন দিল্লীর গর্ভজাত সন্তানদিগের শীর্ষ স্থানে। লৌহ স্তম্ভ, লালকোট, রায় পৃথ্বীরা প্রভৃতি সুদর্শন সমূহ কনিষ্ঠ ভাই ভগ্নী বেশে আমার নিকটে দাঁড়াইয়া। কিন্তু পাঠক, এ স্থানে যাইতে আপনাদিগকে বড় কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। পথের ধূলি খাইতে হইবে। ক্ষণেক উপরে উঠিয়া, ক্ষণেক নীচে নামিয়া, আপনাদিগকে গাড়ীর গতি চালনা উপভোগ করিতে হইবে। আগে বন্দোবস্ত না করিলে "ভীম একাদশী-টাও" করিতে হইবে। এত কষ্ট স্বীকার করিলে, আপনারা প্রাচীন দিল্লীর দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। এত কষ্ট স্বীকার করিলে, অল্লার দোহাই দিয়া বলিতে পারি, সে সময় পারণের দিবসের ন্যায় শিবচতুর্দ্দশীর কষ্ট আপনারা একবারে ভুলিয়া যাইবেন।

প্রাচীন দিল্লী।

৫ই অক্টোবর আমরা অতি প্রত্যুষে প্রাচীন দিল্লী দর্শনার্থে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ব দিবসই একখানা ভাল গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম; কাযেই আমরা পথে বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ না করিয়াই, আমাদের গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। পথের সমুদয় স্থানই ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ; যেন সৃষ্টি-সংহারকারী-কাল-পীড়িত হইয়া, শ্মশান সাজিয়া আছে।

পৃথ্বীরাজের পতনের পর প্রাচীন দিল্লী পাঠান বংশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাদসাহগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ নির্ম্মিত। এই পাঠান দিল্লী এত বড় স্থান যে, ইহাকে লোকে সাত কিল্লা বায়ান্ন দরজার সহর বলিয়া থাকে। পাঠান দিল্লীর দর্শনোপযোগী বিষয় সকলের মধ্যে "লৌহস্তম্ভ, লালকোট, কিল্লা রায় পৃথ্বীরা, ভুতখানা, কুতুব উল ইস্‌লাম মসজিদ, খোজা কুতুবুদ্দীনের সমাধি, কুতুব মিনার, আল্টামাস সমাধি, টোগলকাবাদ, মহম্মদাবাদ, জেহান পান্না, সিরি ও কোত্তিল্লা ইত্যাদিই প্রধান। তদ্ভিন্ন ইতস্ততঃ আরো দর্শনীয় অনেক বিষয় রহিয়াছে।

লৌহস্তম্ভ—লালকোটের মধ্যভাগে সংস্থাপিত। ইহা দিল্লীর অতি প্রাচীন চিহ্ন। মৃত্তিকা'পরি ইহার

উচ্চতা প্রায় ১৫ হাত। মৃত্তিকার নীচেও প্রায় ২৪ হাত নিহিত রহিয়াছে। ইহার বৃত্ত রেখার পরিমাণ প্রায় ৫ হাত হইবে। এই স্তম্ভ গাত্রে কতকগুলি শ্লোক লিখিত আছে। বিশেষ শ্রম স্বীকার না করিলে, তাহা তুলিয়া লওয়া অসম্ভব। রাজা ধব আপন কীর্ত্তিভূজ (বিজয় স্তম্ভ) স্বরূপ ইহাতে "তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন ও তিনি বাহ্লিকদিগকে পরাজয় করিয়া, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন" প্রভৃতি কথা খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার অধিকাংশই গুপ্ত অক্ষরে লিখিত। তৎদৃষ্টে অনুমান হয় যে, রাজা ধব খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের গুপ্তবংশীয় কোন একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন তদ্ভিন্ন ইহাতে "১১০৯ সম্বতে অনঙ্গপাল দিল্লী জনতায় পূর্ণ করেন" বলিয়া, আরো অনেক কথা লিখিত আছে। এই সমস্ত নিদর্শন সত্ত্বেও দিল্লীর অজ্ঞ লোকেরা এই লৌহস্তম্ভ সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা বলিয়া থাকে। কেহ বলে উহা ভীমের গদা—পাণ্ডবগণ স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ পুতিয়া রাখিয়াছেন। কেহ বলে, অনঙ্গপালের সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ এই স্তম্ভ বাসুকী নাগের মস্তকোপরি স্থাপিত বলাতে, তিনি ইহা খুঁড়িয়া দেখিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। তাহাতে মৃত্তিকা গর্ভ হইতে রক্ত বাহির হইতে আরম্ভ করিল ও স্তম্ভ "ঢিলা" হইয়া গেল। এই "ঢিলা" শব্দ হইতে ঢিলি বা দিল্লী নামের উৎপত্তি ভাবিয়া, নিম্নলিখিত কবিতা কথিত হইয়া আসিতেছে—

খিলিতো ঢিলি ভই
তুয়ার ভায়া মত হেঁয়

খর্গবার নামে জনৈক লেখক বলেন, ব্যাসদেব সম্বৎ ৭৯২ সনের বৈশাখ মাসে কৃষ্ণপক্ষের শুভ ত্রয়োদশী তিথিতে পঞ্চবিংশতি অঙ্গুলী প্রমাণ এক লৌহ খন্তি অনঙ্গপালকে (বলবান দেব) প্রদান করিয়া বলিলেন—

তোম্‌সে রাজ কভি যায়গা নেহি
ইয়ে খন্তি বাসুকীকি মাথে গাড়ী গেই। †

এই কথা বলিয়া মুনিবর চলিয়া যাওয়া মাত্রই

বলবান দেব খন্তি উথার দেখি
তব্ লহুসে চুচ্‌তী নিকালী।

অর্থাৎ বলবান্ দেব খন্তি তুলিয়া দেখিলেন তাহা হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে। রাজা ইহাতে ভীত হইয়া, ব্যাসদেবের জন্য পুনরায় লোক পাঠাইয়া, খন্তি আবার পুতিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইহা ১৯ অঙ্গুলীর অধিক পুতিতে পারিলেন না। কিন্তু ব্যাসদেব ফিরিয়া

* তুষারের মত হওয়াতে খিলি ঢিল হইয়া গেল।

† তোমার রাজত্ব কখনও যাইবে না। এই খন্তি বাসুকীর মাথায় বসিয়া গিয়াছে।

আসিয়াই বলিলেন, "এই খন্তির ন্যায় তোমার বংশও অটল থাকিবে না। উনিশ পুরুষ পরে চোহান ও তুর্কীগণ তাহাদিগকে অনুগমন করিবে।"

আবার কেহ বলেন পৃথ্বীরাজ আপন বংশ রাজ্যে দৃঢ় স্থাপিত করিবার মানসে, ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শানুসারে এই স্তম্ভ বাসুকীর মস্তক পর্য্যন্ত প্রোথিত করিয়া রাখেন। পরে তুলিয়া দেখেন ইহার অগ্রভাগ রক্তাক্ত। তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন "ভারত সাম্রাজ্য শীঘ্রই হিন্দু রাজাদিগের হস্তচ্যুত হইবে।" অনেকের আবার ইহাও মত যে, যে পর্য্যন্ত এই লৌহস্তম্ভ প্রোথিত থাকিবে, তাবৎ ভারতের হিন্দু রাজ-শাসন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে না।

লাল কোট—কনোজে রাঠোরদিগের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, দ্বিতীয় অনঙ্গপাল এই "গড়িয়া" (ক্ষুদ্র দুর্গ) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লাল কোটের প্রাচীর লৌহ স্তম্ভের চারিদিকে বেষ্টিত। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই মাইলেরও কিঞ্চিৎ অধিক। প্রাচীরের বহির্ভাগেই দুর্গপরিখা। ইহার কতকগুলি তোরণ ছিল, দুর্গের অনেক স্থান ভগ্ন বলিয়া, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। লালকোট ১০৬০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। সে সময়েও ভারতবর্ষের লোক দুর্গ নির্ম্মাণে কিরূপ পটু ছিল, লাল কোট দৃষ্টেই তাহা অনেকটা অনুমিত হয়।

কিল্লা রায় পৃথ্বীরা—পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তাঁহার

সিংহাসনারোহণের পর, দিল্লী সহর অধিকতর সবল করিবার মানসে, লাল্‌কোটেরও চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া, তিনি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার প্রাচীর-দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ মাইল হইবে। পূর্ব্বে নাকি এই দুর্গের ৯টী তোরণ ছিল, কিন্তু এখন উহার কেবল মাত্র ৪টী পরিলক্ষিত হয়। ইহার অধিকাংশ স্থানই এখন জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে দণ্ডায়মান!! দক্ষিণ প্রান্ত একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, সহজে কেহ দুর্গের অবস্থান উপলব্ধি করিতে পারে না। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে পৃথ্বীরাজের পতনের পর, এই দুর্গের পশ্চিম তোরণ ও লালকোটের রণজিৎ তোরণ দ্বারা মুসলমানগণ দুর্গে প্রবেশ করিয়া, সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। তদবধিই দিল্লীর রাজপাট হইতে হিন্দুরাজার নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই জয়োন্মত্ত মুসলমানগণের পরিচালক "হাজি বাবা রৌজবেঃর" যুদ্ধ পতিত মৃতদেহ লালকোটের উত্তর পশ্চিম পরিখা মধ্যে সমাধিস্থ হইয়াছিল।

ভূতখানা—মুসলমানদিগের সময়ে ৭টী হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নির্ম্মিত। এই ভূতখানায় এখনও অনেকগুলি হিন্দুস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। এই গৃহের নাম কেন যে ভূতখানা হইল, আমরা তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বোধ হয় স্তম্ভ গাত্রে হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত বলিয়াই, মুসলমানগণ ইহার ভূতখানা নামকরণ করিয়াছিলেন।

কুতুব উল ইসলাম মসজিদ—এখন ভগ্নাবশেষ লইয়া দণ্ডায়মান। পাঠানদিগের সময়ে বোধ হয়, ইহা একটী মহা হর্ম্ম্য পরিগণিত ছিল।

গোরস্থান—এস্থানে রাশি রাশি কবর দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে খোজা কুতুবুদ্দীনের কবরই বিশেষ প্রসিদ্ধ ও পবিত্র দরগা বলিয়া অভিহিত। খোজা সাহেবের কবর নিকটে সম্রাট বাহাদুর শাহা ও সাহআলম অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন।

কুতুব মিনার—ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ। অনেকে ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ বলিয়া স্বীকার করেন। সাজাহানাবাদ হইতে কুতুবের দৃশ্য দেখিয়া, আমাদের মন কত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছিল। এখন দেখি সেই মাননীয় মহাকীর্ত্তি আমাদের সম্মুখে অভ্রভেদী মস্তকে দণ্ডায়মান। কুতুব মিনারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, দর্শক মাত্রেরই হৃদয়ে বিস্ময়, কৌতুহল ও অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের যুগপৎ উদয় হয়। ইহার বাহ্যদৃশ্য দেখিতে দেখিতে, আমরা যদি অতীতের কথা স্মরণ করি, তবে যেন এক গুপ্ত শ্মশানের আগুনে আমাদের হৃদয় মন পুড়িয়া যায়। এই কুতুব মিনার উন্নত শিরে দাড়াইয়া, দিল্লীর কত কি অভিনয় দেখিয়া, হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছে। আজিও যেন নীরব ভাষায় দর্শকদিগকে সে সমস্ত কথা বলিয়া, তাহাদের প্রাণে মহা ব্যথা ঢালিয়া দিতেছে।

কুতুব মিনার উচ্চে ২৩৪ ফিট। এক সময় উহা উচ্চে ৩০০ ফিট ছিল, এখন মৃত্তিকায় বসিয়া গিয়াছে। কুতুব ভিত্তির (Base) পরিধি ১৪৭ ফিট। ইহা একটী পঞ্চতল স্তম্ভ। প্রত্যেক খণ্ডই গোলাকার বারেন্দায় পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক তলের গঠন প্রণালীই বিভিন্ন প্রকৃতির। তৃতীয় তল পর্য্যন্ত ইহা রক্ত প্রস্তরে ও তদূর্দ্ধে পঞ্চতল পর্য্যন্ত সমুদয় স্তম্ভ শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। মধ্যভাগ ধূসর প্রস্তরে কারুখচিত। কুতুবে উঠিবার "ঘুরাণ ফিরাণ" পথে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭৯ সিঁড়ি আছে। প্রত্যেক তলের মধ্য গৃহেই আলো সঞ্চারের জন্য অনেক গুলি দ্বার। সিঁড়ি হইতে বারেন্দায় আসিবার জন্য প্রত্যেক তলেই এক একটী পথ রহিয়াছে। মিনারের উপরিভাগ শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়, যেন, বৃদ্ধাবস্থায় একটী শ্বেত টুপী (Night Cap) পড়িয়া, দাঁড়াইয়া আছে। ইহার বহির্ভাগ খোদিত অক্ষরে চিত্রিত থাকাতে, বাহ্যদৃশ্য বড় মনোহর। নিম্ন-তলের চতুর্দ্দিকে ছয়টী চক্রাকার লেখা দৃষ্ট হয়। তাহাদের সর্ব্বোপরি চক্র কোরাণের বয়ানে চিত্রিত। তন্নিম্ন চক্রে আল্লার নিরনব্বই নাম লিখিত ও তৃতীয় চক্রে মেজুদ্দীন, আবুল মজফর ও মহম্মদ বিন্‌সামের (মহম্মদ ঘোরী) প্রশংসা বাক্য চিত্রিত রহিয়াছে। চতুর্থ চক্রও কোরাণের বয়ানে, ও পঞ্চম চক্র সুলতান মহম্মদ বিনসামের প্রশংসা বাক্যে চিত্রিত। নিম্ন চক্রের লেখা গুলি কালের গতিতে এখন

অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় তলের দ্বারদেশে লিখিত আছে "সম্রাট আণ্টামাসের অনুমত্যানুসারে ইহার নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয়।" তৃতীয় তলের দ্বারদেশেও আণ্টামাসের প্রশংসা বাক্য লিখিত। চতুর্থ তলে লিখিত আছে যে, সম্রাট আণ্টামাস মিনার নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি করেন।" ইহা ভিন্ন কুতুব গাত্রে প্রধান মোল্লা ফজিল, ভাস্কর মহম্মদ আমিরচা, ও নাগরী অক্ষরে মহম্মদ টোগলক (১৩৪২ সম্বৎ) ও ফিরোজ সাহা টোগলকের নাম লিখিত আছে। এরূপ জনরব যে, বজ্রাঘাতে ইহার শিরোভাগ ভগ্ন হওয়াতে, ফিরোজ সাহা টোগলক নানাপাল নামে জনৈক হিন্দু শিল্পী দ্বারা তাহা পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৫০৩ খৃঃ অব্দে ইহা আবার ভগ্ন হয়। সেকান্দর লোদী ফতে খাঁ নামে জনৈক মুসলমান শিল্পী দ্বারা তাহা পুনঃ সংস্কৃত করেন। ১৮০৩খৃঃ অব্দে ইহা ভূমিকম্পে কিঞ্চিৎ বিধ্বংশ হইয়াছিল; কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে পুনরায় সংস্কৃত হইয়াছে। এরূপ পুনঃ পুনঃ প্রকৃতির অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়াও, মানুষের স্নেহ ভক্তিতে ইহা এখনও মনোহর দেহে জীবিত।

কুতব মিনার হিন্দুদিগের সাময়িক কি, মুসলমানদিগের সময়ে নির্ম্মিত; তাহা লইয়া এখনও লোকের নানা মত দৃষ্ট হয়। কিন্তু দ্বিতীয় আকবর সাহার সভাসদ সৈয়দ মহম্মদ নামে জনৈক মুন্সী বলিয়াছেন—কোন হিন্দু রাজা তদীয়

প্রিয়তমা কন্যার প্রাত্যহিক যমুনা সন্দর্শনার্থে, এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কুতুব মিনারের প্রবেশ দ্বার উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহা বিবেচনা করিলেও, কুতুব হিন্দু নির্ম্মিত বলিয়াই অনুমিত হয়। কুতুব মিনার পুনঃ পুনঃ আংশিক ভগ্ন হইয়া, মুসলমান সম্রাট কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হওয়াতেই, ইহার অবয়বে "তোবা" পড়নের লক্ষণটা পরিলক্ষিত হয়। তাহাতেই ইহার হিন্দু নাম লুপ্ত হইয়া, কুতুব মিনার নাম হইয়াছে। কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজার ন্যায় ভারতের অনেক হিন্দু স্তম্ভ ও হর্ম্ম্যই "তোবা" পড়িয়া, এইরূপ দশার দশাগ্রস্ত। যদ্যপি কুতুব গাত্রে কুতুবুদ্দীন, আল্‌টামাস প্রভৃতি মুসলমান সম্রাটগণের নাম চিত্রিত রহিয়াছে, তবু ইহার ভিত্তি ও অবয়ব দৃষ্টে, ইহা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ নির্ম্মিত বলিয়া সন্দেহ হয়।

কুতুবের উপর হইতে চতুর্দ্দিকের শোভা বড় মনোহর দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বদিকে যমুনা রজত রেখায় প্রবাহিত। পশ্চিমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল শ্রেণী। উত্তরে পূর্ব্বে জাহানাবাদ ইত্যাদি দিল্লীর অন্যান্য দৃশ্য। ইহার শিরোভাগে উঠিতে আমাদের প্রাণান্ত কষ্ট হইল। আমরা প্রত্যেক তলেই কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, বিশেষ রূপে গৃহগুলি পরিদর্শন করিলাম ও পরে নামিয়া নিকটস্থ অন্যান্য দ্রষ্টব্য বিষয় দেখিলাম। কথিত আছে একদা একটা পাগল ইহার শিরোভাগ হইতে পড়িয়া, বন্দুকের শব্দের ন্যায় প্রকাণ্ড শব্দে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কুতুবের নিকট এখনও একটী অসম্পূর্ণ মিনারের ভিত্তি পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভিত্তি কুতুবের ভিত্তির দ্বিগুণ হইবে। হিন্দুদিগের মত—ইহা পৃথ্বিরাজ স্বীয় কন্যার গঙ্গা সন্দর্শনার্থে নির্ম্মাণ করিতে ছিলেন। মুসলমান আক্রমণে ইহা অসম্পূর্ণ রহিয়াগিয়াছে। মুসলমানগণ বলেন এই অসম্পূর্ণ মিনারও আলাউদ্দীন নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়াতে, ইহা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

আলটামাস সমাধি—কুতুব মিনারের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ১২৩৬ খৃঃঅব্দে মানসুদ্দীন আলটা-মাসের মৃত্যুর পর, তদীয়পুত্র সুলতান রোকিউদ্দীন ও কন্যা সুলতানা রেজিয়া কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমাধি মন্দিরের উপরে কোন ছাদ নাই। কবর হইতে উত্থিত হইয়া, স্বর্গে উঠিবার সময় প্রেতাত্মা যাহাতে কোন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্যই ইহার ছাদ নির্ম্মিত হয় নাই। এই সমাধি মন্দিরের সন্নিকটেই কয়েকটী গভীর বৃহত কুপ দৃষ্ট হয়। তাহার বৃহত্তমটী দ্বিতীয় অনঙ্গপাল খনন করাইয়া ছিলেন।

কুতুবের নিকটে আর একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহাও এখন ছাদ শূন্য। লোকে বলে—আলাউদ্দীন আপন সমাধির জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে আলাউদ্দীনের সমাধির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না।

আলাইয়া দরজা—আলাউদ্দীনের তোরণ বলিয়া অভিহিত। এই তোরণ-গৃহের অনেক স্থানে আলাউদ্দীনের নাম খোদিত থাকাতেই, ইহা তৎসাময়িক বলিয়া কথিত হয়। আলাইয়া দরজার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে ইমাম্ জামিনের সমাধি। এই সমাধি হুমায়ূনের রাজত্বকালে ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই।

যোগমায়া—এই দেবী মূর্ত্তি কুতুব মিনারের উত্তর দিকে প্রতিষ্ঠিত। কোন সময়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া, যোগমায়া মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। এত মুসলমান অত্যাচারেও যে, ইহা পূর্ব্বরূপ রক্ষিত আছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমাদের বিশ্বাস—ইহা মোগল রাজত্বের শেষভাগে রাজপুতানার কোন হিন্দুরাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নতুবা যে মুসলমান জাতি হিন্দুর দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া, ভূতখানা নির্ম্মাণ করিয়াছে; যাহারা হিন্দু নাম, হিন্দু ধর্ম্ম লোপ করিবার সংকল্প করিয়াছিল; অতি পূর্ব্বে হইলে তাহারা কখনও যোগমায়াকে এ মন্দিরে এরূপ অবস্থায় থাকিতে দিত না।

মেটকাফ হল—পূর্ব্বে আকবরের অন্যতম পালক পিতা মহম্মদ কুলিখাঁর সমাধি মন্দির ছিল। সার চার্লস থিও ফিলাস্ মেটকাফ্ সাহেব যখন দিল্লীর রেসিডেণ্ট, সে সময় তিনি ইহাতে অবস্থান করিতেন বলিয়াই ইহার নাম

মেটকাফ্ হল হইয়াছে। ভারতে মুসলমান অধিকারের পর তাহারা যেমন অনেক হিন্দু মন্দিরকে কেবা পড়াইয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, মুসলমান নামকরণ করিয়াছিল; ইংরেজ অধিকারের পর তদ্রূপ তাহারাও আবার অনেক মুসলমান মন্দিরকে জর্ডানের পানী সিঞ্চনে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, খৃষ্ট নাম প্রদান করিয়াছে। যখন যিনি রাজা তখন তাঁহার ধর্ম্মই প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়।

টোগলকাবাদ—টোগলকগাজী কর্ত্তৃক ১৩২১ খৃঃঅব্দে আরম্ভ করিয়া, ১৩২৩ খৃঃঅব্দে এক গণ্ড শৈলোপার নির্ম্মিত। ইহা কুতুব হইতে ৩॥০ মাইল দূরে উত্তর পূর্ব্বদিকে ও দিল্লী হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ডে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীর পরিমাণ ৪ মাইলেরও কিঞ্চিৎ অধিক। দুর্গের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বভাগ পরিখায় বেষ্টিত। দক্ষিণ প্রান্তে এক প্রকাণ্ড জলাশয়। অনেকে বলেন তুয়ার বংশীয় মহীপাল নামে জনৈক রাজা যমুনার জল প্রাচীরে আবদ্ধ করিয়া, এই জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। তোগলকাবাদ দৃঢ় দুর্গ বলিয়া অভিহিত। দুর্গে ১৩টী প্রবেশ দ্বার আছে। মধ্যভাগে বিরাজ মন্দির, জুম্মা মসজিদ ও কতক গুলি জলাশয় জীর্ণবেশে বিরাজ করিতেছে। তোগলকাবাদের দ্রষ্টব্য বিষয় গুলির মধ্যে তোগলক সাহার সমাধি মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয়। ইহা দুর্গ দক্ষিণে জলাশয়ের মধ্য ভাগে সংস্থাপিত। দুর্গ হইতে তথায় যাইবার জন্য

একটী সেতু রহিয়াছে। ভ্রমণকারী দিগের পক্ষে এই মনোহর সমাধি মন্দির একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়।

মহম্মদাবাদ—টোকগলক সাহার পুত্র জোন্না ফকিরুদ্দীন ওরফে মহম্মদ টোগলক কর্ত্তৃক টোগলকাবাদের দক্ষিণ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পিতৃ নির্ম্মিত দুর্গ হইতে ইহা আকৃতিতে অতি ক্ষুদ্র। প্রাচীর পরিমাণ অর্দ্ধ মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক। মহম্মদাবাদে দেখিবার বিশেষ কিছু এখন নাই।

জেহান পান্না—একটী দুর্গ বদ্ধ ক্ষুদ্র সহর। ইহাও মহম্মদ তোগলক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। জেহান পান্না রায় পিথৌরার উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। স্থানে স্থানে প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন জেহান পান্নায় দেখিবার আর কিছুই নাই।

রোষণ চিরাগ—সিরির দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে, কুতুব হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটী প্রাচীর বেষ্টিত বৃহত দরগা। বাদ সাহ ফিরোজ সাহা সেখ নাসিরুদ্দীন মহম্মদের স্মরণার্থেও সম্মানার্থে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নাসিরুদ্দীনের কবর পশ্চাতেই সুলতান বিলোলী লোদীর সমাধি। এই স্থানে দর্শনোপযোগী আরো কতকগুলি সমাধি বর্ত্তমান আছে।

সিরি অথবা কিল্লা আলাইয়া—তোগলকাবাদের নিকটে কুতুব হইতে ৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে সাহাপুরে ইহার ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। সিরি আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তিনি

মোগল দিগকে এস্থানে এক যুদ্ধে পরাজয় করিয়া জয়চিহ্ন স্বরূপ এ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে শের সাহাও দিল্লী জয় করিয়া, সিরির দ্রব্য জাতে শেরগড় নির্ম্মাণ করিলেন। পূর্ব্বে এই দুর্গে "কেইসর হাজার সেইতন" নামে সহস্র স্তম্ভযুক্ত এক রাজ ভবন ছিল। সেই রাজভবনে বসিয়াই পাপাত্মা আলাউদ্দীন গুজরাতের কমলাদেবীর প্রেম দাস হইয়া থাকিতেন। আবার সেই রাজভবনেই কমলাদেবী-কুমারী দেবল দেবীর ও আলাউদ্দীন-কুমার খিজিরের প্রেম মিশ্রিত হইয়া, পার্শী ও হিন্দি মিশ্রিত উর্দ্দু ভাষার ন্যায়, এক উর্দ্দ প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছিল। আজি তাঁহারা সকলেই নির্ব্বাপিত।

ভুলভলিঞ্জা বা গুম্ গাস্‌টেজি—আদম খাঁর সমাধি। ইহা কুতুবের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ও ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। আদম খাঁ আকবরের একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন। তিনি মালব জয়ে প্রেরিত হইলে, মালবের আফগান রাজের সেনাপতি বাজ বাহাদুর আদম খাঁর ভয়ে মালব হইতে পলায়ন করিলেন। তদীয় হিন্দুপ্রণয়িনী অনুপম-রূপ-রাশি-রূপমতী তখন আদম খাঁর হস্তে পতিত হইলেন। রূপমতী যেরূপ সুন্দরী ছিলেন তদ্রূপ বিদুষী ও গায়িকা ছিলেন। তিনি আদম খাঁর দুরভি-সন্ধি জানিতে পারিয়া আদম খাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইত্যবসরে রূপমতী

রূপমতী বিষপান ও মুখাচ্ছাদন করিয়া, শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। দুর্দ্দান্ত আদম খাঁ গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখেন, রূপমতীর প্রাণ দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আজিও মালবে রূপমতীর নাম ও গীতাবলী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। * আদম খাঁ মালব জয় করিয়া, বড় ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন ও বিদ্রোহী রূপে আকবরকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। এই আদম খাঁই আকবরের পালক পিতা উজীর সামসুদ্দীন মহম্মদ খাঁকে উপাসনা কালে হত্যা করিয়া,প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

কির্কি—একটী প্রাচীর বেষ্টিত ক্ষুদ্র সহর। ইহা কুতুবের উত্তর পূর্ব্বে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। সম্রাট ফিরোজ সাহার রাজত্ব কালে (১৩৮০ খৃঃ অব্দে) খাঁ জাহান ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে কির্কি নামে একটী মস্‌জিদ বিদ্যমান আছে। মন্দিরের অনেক স্থান ভগ্ন হইলে ও ইহা একটী দর্শনীয় বিষয়।

হাস্ খাঁস—গ্রাম কির্কির ১ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। এ স্থানে ফিরোজ সাহার স্নানাগার ও তৎ খনিত একটী জলাশয় আছে। ফিরোজ সাহার মৃত দেহ এই স্থানেই সমাধিস্থ! স্নানাগারের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

---

* Elphinstone's History of India.

সাফদর জঙ্গের সমাধি—হাস খাসের উত্তরে অবস্থিত। অযোধ্যার ২য় নবাব সাফদর জঙ্গ বাদসাহ আমেদ সাহার উজীর ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মনসুর আলী খাঁ। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, তৎপুত্র সুজা উদ্দোল্লা কর্ত্তৃক তাজমহলের অনুকরণে এই সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই সমাধি মন্দির তাজমহল অপেক্ষা আকৃতিতে ক্ষুদ্র। ইহার চতুর্দ্দিক একটী প্রাচীরে বেষ্টিত। এখন ইহার যেরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়, শীঘ্র সংস্কৃত না হইলে ইহাকে আর অধিক দিন এই অবস্থায় থাকিতে হইবে না।

যন্ত্র মন্ত্র—লাহোর দরজা হইতে বাহির হইয়া, কুতুবের পথে সাফদর জঙ্গ সমাধির উত্তর ইহার ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট মহম্মদ সাহার রাজত্ব কালে মহারাজা জয় সিংহ কর্ত্তৃক এই জ্যোতিষ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। যন্ত্র মন্ত্রে এখন দেখিবার বিশেষ কিছু নাই।

ফিরোজাবাদ—মহম্মদ তোগলকের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ফিরোজ সাহা টোগলক কর্ত্তৃক এই সহর নির্ম্মিত হয়। ইহার অন্য নাম ফিরোজ সাহার কোটিলা। ফিরোজাবাদ বর্ত্তমান দিল্লীর দক্ষিণ পূর্ব্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত। ফিরোজাবাদের প্রধান দৃশ্যের মধ্যে ভীমের গদা বা ফিরোজ দণ্ড, ও কালা মসজিদই প্রধান। হিন্দুগণ এই প্রস্তর স্তম্ভকে ভীমের গদা, মুসলমানগণ সম্রাট ফিরোজ সাহার যষ্টি ও অনেকে আলেকজাণ্ডারের জয় স্তম্ভ বলিয়া অনুমান করেন। পরে

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্থির করিয়াছেন যে, ইহা অশোকের শিলা স্তম্ভ। বৌদ্ধধর্ম্মের চিরস্থায়ীত্ব কামনায়, বর্ত্তমান দিল্লী হইতে অনেক দূরে, যমুনা-তটস্থ সেলোরা ডিষ্ট্রীক্টের তোব্রা-গ্রামে ইহা প্রোথিত হইয়াছিল। অজ্ঞলোকে ইহাকে ভীমের গদা ও অচল বলিয়া অভিহিত করিত। ফিরোজ সাহা টোগলক হিন্দুদিগের এই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার মানসে, ইহা তোব্রা হইতে তুলিয়া আনিয়া, আপন ভবন প্রাঙ্গণে প্রোথিত করিয়াছিলেন। অনেকে আবার এই স্তম্ভ ইন্দ্রপ্রস্থের নিগাম্বড় ঘাটে অবস্থিত ছিল বলিয়াও অনুমান করেন। এই স্তম্ভে পালি ভাষা লিখিত অশোকের শ্লোক, আজমীর রাজ বিশাল দেবের দিল্লী জয় সংবাদ, ফিরোজ সাহার আত্ম প্রশংসা ও ভয়ঙ্কর নাগ নামে এক জন শৈব যোগীর নাম ত্রিশূল সহ খোদিত আছে। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর, এই স্তম্ভের শিরোভাগ স্বর্ণ বর্ণে চিত্রিত ছিল বলিয়া, ইহার "মিনার জেরিন্" (স্বর্ণ স্তম্ভ) নাম করণ হইয়াছিল। কালা মসজিদে এখন দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। ইহা রুমী দরওজার নিকটে অবস্থিত। ফিরোজা বাদ বা কোতিলা এখন প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষে পূর্ণ একটী "ময়দানে" পরিণত।

পাঠান দিল্লীর দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে "বড় খাঁ", "ছোট খাঁ" ও "কালা খাঁ" নামে আরো তিনটী দর্শনীয় সমাধি মন্দির বিরাজ করিতেছে। আমরা তাহার নিকটে যাইয়া,

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাই। এই ত্রিভূজের নিকটে মোবারিক পুরে মোবারিক সাহার সমাধি আজিও বিরাজিত।

পূর্ব্বোক্ত দ্রষ্টব্য বিষয় গুলি ব্যতিত পাঠানদিগের সাময়িক অন্য কোন বিশেষ চিহ্ন দিল্লীতে পরিলক্ষিত হইল না। তবে যমুনাতীরে "কিলকেরী" নামে কেইকোবাদের রাজ ভবনের চিহ্ন এখনও দিল্লীবাসী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াথাকে।

বর্ত্তমান দিল্লী বা সাজাহানাবাদ।

৩ রা অক্টোবর। বর্ত্তমান দিল্লীর প্রকৃত নাম "সাজাহানাবাদ"। বাদসাহ সাজাহান কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগেই ভারতের রাজধানী আগ্রা হইতে আবার দিল্লীতে সংস্থাপিত হয়। তদবধিই আগ্রার অবনতি ও দিল্লীর পুনরায় উন্নতি আরম্ভ।

বর্ত্তমান দিল্লী একটী দুর্গ বদ্ধ সহর। আরাবলী পর্ব্বত সমস্ত রাজপুতানা ছাইয়া দিল্লীর নিকট জুজুলা ও বিজুলা নামে দুই শাখায় যমুনাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছে। আরাবলীর সেই দুই শাখাগ্র বিধ্বংশ করিয়া তদুপরি বর্ত্তমান

দিল্লী নির্ম্মিত। কিন্তু সহরে এখন পর্ব্বতচিহ্ন বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। যমুনার দিক ভিন্ন সমস্ত সহরের অন্যান্য দিক যে প্রাচীরে বেষ্টিত, বাহির হইতে সহরে আসিবার ও যাইবার জন্য তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ দশটী তোরণ আছে। তন্মধ্যে উত্তরে কাশ্মীর দরজা ও মুরি দরজা, পশ্চিমে কাবুল দরজা ও লাহোর দরজা, দক্ষিণ পশ্চিমে ফরাশখানা দরজা ও আজমীর দরজা, দক্ষিণে রুমি ও দিল্লী দরজাই প্রধান। তদ্ভিন্ন যমুনার দিকে পূর্ব্ব প্রান্তে রাজ ঘাট দরজা ও উত্তর পূর্ব্বে কলিকাতা দরজা নামে আরো দুইটী তোরণ আছে।

সহরের পূর্ব্ব প্রান্তে বর্ত্তমান দিল্লীর কিল্লা (Fort)। পূর্ব্বে ইহাই বাদসাহদিগের রাজভবন ছিল। আগ্রার কিল্লা পরিদর্শনের ন্যায় দিল্লীর কিল্লা পরিদর্শন করিতে ও ব্রিগেডিয়ার সাহেবের একখানা পাশ আবশ্যক করে। আমাদের পাশ আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে বলিয়া, সর্ব্বাগ্রে জুম্মা মসজিদ পরিদর্শন করিতে যাত্রা করিলাম।

চাঁদনি চকের অতি সন্নিকটেই জুম্মা মসজিদ। আমরা মসজিদ প্রাচীরের উত্তর দরজা দ্বারা আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলাম। হিন্দু বলিয়া মসজিদের সম্মানার্থে আমাদিগকে জুতা ছাড়িয়া, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। ইহা এক প্রকাণ্ড মসজিদ—ভারতের একটী অত্যাশ্চর্য্য দর্শনোপযোগী হর্ম্ম্য। এমন কি, ইহা শ্বেত প্রস্তরে সম্পূর্ণ গঠিত হইলে, বাহ্যাকৃতিতে তাজমহলকে ও পরাস্ত করিতে সক্ষম

হইত। জুম্মামস্‌জিদ্‌ উচ্চতায় দিল্লীর অন্যান্য হর্ম্ম্য হইতে শ্রেষ্ঠ। মসজিদের মধ্যভাগ এত বিস্তৃত যে, এক কালিন ২০০০ দুই সহস্র লোক বসিয়া, তাহাতে নেমাজ পড়িতে সক্ষম হয়। মস্‌জিদের সম্মুখ ভাগেই একটী শ্বেত প্রস্তরের ভাণ্ডে জল রক্ষিত আছে। মুসলমানগণ সেই পবিত্র জলে "অজু" (প্রক্ষালন) করিয়া, নেমাজ পড়িয়া থাকে। মসজিদ প্রাঙ্গনের-সম্মুখকোণদ্বয়ে দুইটী স্তম্ভ। আমরা একটী স্তম্ভে উঠিয়া, দিল্লীর বাহ্য দৃশ্য পরিদর্শন করিলাম। জুম্মা মসজিদের ভিতরে পশ্চিমে প্রান্তে একটী শ্বেত প্রস্তরের মঞ্চ। বাদ সাহসাজা-হানের হস্তলিপি এখনও প্রাচীর গাত্রে খোদিত রহিয়াছে। এই গৃহের উত্তর পূর্ব্ব কোণে এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে একখানা কোরাণ সযত্নে রক্ষিত। তাহা নাকি ইমাম হোসেনের পিতা কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। ইমাম হোসেনের পিতা হজ্র-রত আলী মহম্মদের জামাতা। মহম্মদের সমকালীন বলিয়া, মুসলমানগণ এই কোরাণকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে।

বাদসাহ সাজাহান ১৬২৯ খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া, ১৬৪৮ খৃঃঅব্দে এই মহাহর্ম্ম্য পরি সমাপ্ত করেন। কথিত আছে ইহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ১০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। বিগত শিপাহী-বিদ্রোহের সময় জুম্মা মস-জিদ এক ভীষণ-রঙ্গালয় হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিল।

পাশ আনীত হইলে আমরা কিল্লা পরিদর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। সম্রাট সাজাহান ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে প্রায়

৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, আগ্রা কিল্লার অনুকরণে এই কিল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যমুনার দিক ভিন্ন দিল্লীর কিল্লা উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীর পদে সুগভীর পরিখা শুষ্ক মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। কিল্লায় দিল্লী ও লাহোর দরজা নামে দুইটী তোর আছে। আমরা লাহোর দরজা দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তৎপর আর একটী দরজা ও নহবত খানা ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া দেওয়ানী আমের নিকট বর্ত্তী হইলাম। দিল্লীর দেওয়ানী আম আগ্রার দেওয়ানী আম অপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ। ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে আরম্ভ করিয়া, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে এই হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়। এই গৃহের তিন দিকই সম্পূর্ণ খোলা। চারি শ্রেণী স্তম্ভ প্রকাণ্ড ছাদটী মস্তকে করিয়া সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। দেওয়ানী আমের পশ্চাত-প্রাচীর-সম্মুখে বাদ সাহের শ্বেত প্রস্তর আসন। আসনের চারি কোণে চারিটী কারু খচিত শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভ। তদুপরি একখানা পরম সুন্দর কারু খচিত শ্বেত প্রস্তরের চন্দ্রাতপ। দিল্লীশ্বরের এই আসন একখানা শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত পরম সুন্দর দেব মন্দিরের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। এই দেওয়ানী আমের সম্রাট-আসন সম্মুখেও স্তম্ভ সমূহের পদে আমীর, ওমরাও ও দেশীয় নৃপতি বৃন্দের পদমর্য্যাদানুসারে আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই দেওয়ানী আমে বসিয়াই, সাজাহান আপন প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য বলে ইয়োরোপ খণ্ডে আপনাকে দি গ্রেট মোগল (The Great Mogul) নামে

পরিচিত করিয়াছিলেন। আজি সেই গ্রেট মোগলের দরবার গৃহ ইংরেজ সেনার আবাস। ভারত অদৃষ্টে এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

দেওয়ানী আম পরিদর্শন করিয়া, আমরা দেওয়ানী খাস্ পরিদর্শন করিলাম। দেওয়ানী খাস্ দেওয়ানী আমের পূর্ব্ব ভাগেও সমকালে নির্ম্মিত। ইহা অতি সুন্দর গৃহ; শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভোপরি দাড়াইয়া যেন, যমুনার শীতল সমীরণে শীতল হইতেছে। এই দেওয়ানী খাস পরিদর্শন করিলেই, পূর্ব্ব ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের বিপুল সমৃদ্ধি অনেকটা উপলব্ধ হয়। পূর্ব্বে ইহার শিরোতল কারু খচিত রৌপ্য পত্রে চন্দ্রাতপের ন্যায় মণ্ডিত ছিল। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রগণ তাহা অপহরণ করিয়া, তাহা দ্বারা নাকি ১৭ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিল। এখন গিল্টিকরা তাম্রপত্রে সেস্থান কতক পরিমানে পূর্ব্বমত সজ্জিত রহিয়াছে। দেওয়ানী খাস এরূপ মনোহর হর্ম্ম্য যে, তাহার মধ্য ভাগের কার্ণিশ গাত্রে লিখিত আছে "যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে তবে এস্থানেই সে স্বর্গ, এস্থানেই সে স্বর্গ, এস্থানেই সে স্বর্গ।"

পূর্ব্বে এই দেওয়ানী খাসেই সাজাহান বাদসাহের জগত বিখ্যাত ময়ূরাসন (তক্ত তাউস) অবস্থিত ছিল। পারশ্যাধিপতি, নরপিশাচ, রাক্ষস-প্রবৃত্তি নাদির সাহা দিল্লীর প্রায় লক্ষাধিক অধিবাসীর প্রাণ সংহার করিয়া, মহম্মদ সাহার রাজত্ব কালে, এই গৃহ হইতে সেই মণি-

মুক্তা খচিত ময়ূরাসন অপহরণ করিয়া স্বদেশে লইয়া গেলেন।

দেওয়ানী খাস পরিদর্শন করিয়া, আমরা বাদ সাহের অন্দর মহল পরিদর্শন করিলাম। অন্দর মহলের এক স্থানের নাম রং মহল ও অন্য স্থানের নাম মতি মহল। এই অন্দর মহলেই এক সময় মমতাজ মহলের, রশিনারা ও জেহানারা বেগমের অনুপম রূপ রাশি প্রস্ফুটিত হইয়া, ইহা অপসরা পুরী করিয়া তুলিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাশি ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার (Bernier) সাহেব ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজি ইহার শোভা সৌন্দর্য্য সমুদয়ই কালের গর্ভে লুক্কায়িত।

কিল্লার ভিতরে বাদ সাহের স্নানাগার একটী দর্শনীয় গৃহ। উহা তিন খণ্ডে বিভক্ত। একগৃহ শৈত্য স্নান, একগৃহ উষ্ণ স্নান ও অপরটী নাতি শীতোষ্ণ স্নানের জন্য ব্যবহৃত হইত। গৃহের মধ্যভাগ শ্বেত প্রস্তরে মণ্ডিত। প্রত্যেক গৃহের মধ্যভাগেই এক একটী ফোয়ারা নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্বেত প্রস্তরের জলাধার সকল প্রাচীর গাত্রে নিবিষ্ট। স্নানাগারের প্রকৃত নাম "হুম্মায়ুম"। এখনও এই স্নানাগার অতীতের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া, মোগল সম্রাটের বিলাসীতার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে।

মতি মস্‌জিদ্—আগ্রার কিল্লার ন্যায় দিল্লীর কিল্লাতেও একটী মতি মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। বাদসাহ

আরঙ্গজীব ১৬৫৮খৃঃঅব্দে আরম্ভ করিয়া, ১৭০৭ খৃঃঅব্দে এই মতি মস্‌জিদ্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং এই পরম সুন্দর মসজিদে নেমাজ পড়িয়া, ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। বিগত শিপাহী যুদ্ধের সময় কামানের গোলা লাগিয়া, ইহার একস্থান একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

তস্‌বিরখানা—মুসলমানী ভাষায় ছবিকে তস্‌বির্ কহে। এই গৃহে এখন দেখিবার কিছুই নাই। প্রাচীর গাত্র-খোদিত ফুল পাতার চিত্র ভিন্ন ইহাতে অন্য কোন চিত্র এখন পরিলক্ষিত হয় না।

ফরাশি ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার (Bernier) সাহেব দিল্লীর কিল্লাতে "সাহাবাগ" (রাজকীয় উদ্যান) নামে একটী পরম সুন্দর উদ্যানের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার বিশেষ চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইলাম না। সেই দিবস কিল্লার অন্যান্য স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়াই, আমরা গৃহে চলিয়া আসিলাম।

বিকাল বেলা আমরা দিল্লীর মিউজিয়ম ও কুইনস্ গার্ডেন (Queen's garden) পরিদর্শন করিলাম। মিউজিয়মটী তত জাঁকাল না হইলেও উহাতে দেখিবার অনেক জিনিষ রহিয়াছে। পূর্ব্বে আগ্রার কিল্লায় হস্তীপৃষ্ঠে জয়মল ও পুত্তের যে প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছিল, সাজাহান তাহা আগ্রা হইতে দিল্লীতে লইয়া আসেন। সেই বাহন শূন্য ভগ্ন প্রতিমূর্ত্তি এক্ষ মিউজিয়মের দ্বার দেশেই রক্ষিত। গৃহমধ্যে ভারত-

বর্ষের গবর্ণর জেনেরেল দিগের চিত্র সহ আরো অনেক চিত্র রক্ষিত আছে। পূর্ব্বে মিউজিয়মের দ্রব্যজাত কিল্লার দেওয়ানী খাসে সজ্জিত ছিল; এখন সে সমস্ত দ্রব্য বর্ত্তমান মিউজিয়মে আনীত হইয়া, উহা দিল্লী ইন্‌ষ্টিটিউট্ (Delhi Institute) নামে অভিহিত হইতেছে।

কুইন্‌স্‌বাগ একটী পরম সুন্দর বিস্তৃত উদ্যান। বাগানের একপার্শ্বেই জয়মলের প্রস্তর মূর্ত্তির বাহন হস্তীটী ভগ্ন কলেবরে দাঁড়াইয়া। এই বাগানে একটী সুন্দর প্রাণী বাটিকা (Zoological Depertment) আছে। তাহাতে ব্যাঘ্র ইত্যাদি কতকগুলি জন্তু প্রতিপালিত হইতেছে। এস্থানে ফল ভারাবনত রাশি রাশি কমলালেবুর গাছ দেখিয়া, এপক্ষের একটুকু চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ভায়া আজমীরে, ইহা মনে করিয়াই, তাহা অনেকটা প্রশমিত হইয়া গেল। তখন স্থির করিলাম, আজমীরে ফিরিয়া যাওয়ার কালে, ভায়ার জন্য দিল্লীর লাড্ডু লইয়া যাইতে হইবে।

বাদসাহ সাজাহানের সময়ে দিল্লীর উত্তর পশ্চিমে "সলিমার বাগ" নামে এক পরম সুন্দর উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বাগান নাকি শোভা সৌন্দর্য্যে নন্দন কাননকেও ধিক্কার করিয়া, সাজাহানের অতুল ঐশ্বর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিল। ইহা ৯ বৎসরে প্রায় ১ কোটী টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু তাহার নাম গন্ধও এখন পরিলক্ষিত হয় না; কালের মহাস্রোতে যেন সম্পূর্ণ ধুইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান দিল্লীতে মতি মসজিদ ভিন্ন আরঙ্গজীব নির্ম্মিত অন্য কোন হর্ম্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়না। অন্যান্য বাদসাহদের যাহাতে বাসনা, আরঙ্গজীবের তাহাতে বীতরাগ। তিনি মতি মসজিদে ফকিরের পরিচ্ছদে সর্ব্বদা নেমাজ পড়িতেন। তৎজন্য অনেকে তাঁহাকে “নেমাজী” নামে অভিহিত করিয়া থাকে। অথচ নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার প্রভৃতি পাশব ক্রিয়াতে তাঁহার চরিত্র যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছিল; মোগল সম্রাট-দিগের মধ্যে অন্য কাহারো চরিত্র তদ্রূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে নাই। বাদসাহ আরঙ্গজীবের রাজত্ব কালে দিল্লীতে কুমারী মসজিদও রসিনারা বাগ নামে আরো দুটী দর্শনীয় বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুমারী মসজিদ—উহার অন্য নাম জিন্নত মসজিদ। আরঙ্গজীবের চির-কৌমার্য্য-ধারিণী রূপময়ী কন্যা জিন্নত-উন্নেসা নিজ ব্যয়ে যমুনা তীরে এই মনোহর মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাদসাহ সাজাহান স্বপুত্র আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইলে, তদীয় পরম সুন্দরী বালিকা জেহানারা যেমন পিতাকে কারাবাসে পরিচর্য্যা করিবার জন্য চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন; জিন্নতউন্নেসাও তদ্রূপ চির-কৌমার্য্য অবলম্বনে আপন সুখ দুঃখ লইয়া অনন্তে চলিয়া গিয়াছেন।

রসিনারা বেগম—দিল্লীর কাবুল দরজার উত্তরে স্থাপিত। তন্মধ্যে আরঙ্গজীবের অন্য কন্যা রশিনারা ওরফে

জীবন উন্নেসার মৃত দেহ সমাধিস্থ হইয়াছে। অনেকে বলেন এই রশিনারাই এক সময় শিবজীর বন্দী হইয়া, তাঁহার প্রতি আশক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে বন্দী পিতামহের প্ররোচনায় শিবজীর আশা পরিত্যাগ করিয়া, চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিলেন।

বাদসাহ মহম্মদ সাহার সময়ই দিল্লীর শোভা সৌন্দর্য্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। সে সময় বাদসাহ ভবন ভিন্ন আমীর ওমরাওবর্গের বাস ভবন সকলও এক একটী রাজ ভবন বেশে দিল্লীর বক্ষ শোভা করিয়াছিল। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা এখন সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত। মহম্মদ সাহের সমসাময়িক দিল্লী সহরের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তস্থ খুদিসি বাগ ও কাবুল গেটের নিকটবর্ত্তী তেজ হাজারী বাগ এখনও জীর্ণদেহে বাঁচিয়া আছে। মহম্মদ বাদসাহের মাতা খুদিসি বেগম কর্ত্তৃক খুদিসি বাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তেজ হাজারী বাগে মহম্মদ সাহার মহিষী মুলফা জেমানী বেগমের সমাধি রহিয়াছে।

রোষন উদ্দৌল্লা—১৭২১ খৃঃ অব্দে রক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত হয়। ইহা দিল্লীর রাজ ভবনের নিকটে অবস্থিত। এই স্থান দেখিলেই পাপাত্মা নিষ্ঠুর নাদির সাহার ভারত আক্রমণ ভারতবাসীর মনে জাগিয়া উঠে। নাদির সাহার দিল্লী অবরোধের পর, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া, একটী মিথ্যা জনরবের সৃষ্টি হয়। তৎশ্রবণে দিল্লীবাসী

নাদির সাহার কয়েক জন সৈনিককে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। পারস্যাধিপতি ইহাতে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি এইস্থানে বসিয়াই, দিল্লীবাসীদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিতে অনুমতি করিলেন। পারস্য সেনাও পশুর ন্যায় লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। দিল্লী লোক শূন্য হয়। বাদসাহ মহম্মদ সাহা অমাত্যবর্গ সহ কম্পিত হৃদয়ে এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নাদির সাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। ওমরাওগণ তাঁহাকে লইয়া, নিতান্ত সাহসে নির্ভর করিয়া, অবনত মস্তকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন নাদির জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি চাও।" তাঁহারা উত্তর করিলেন "দিল্লী রক্ষা করুন।" মহম্মদের মুখ হইতে কিন্তু একটী কথাও বাহির হইল না; কেবল চক্ষু হইতে দর দর জল পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে নাদির দয়ার্দ্র হইয়া, আপন তরবারী কোষবদ্ধ করিলেন ও কহিলেন "মহম্মদ সাহার জন্যই আমি আজি ক্ষমা করিলাম।" পারস্য সেনাও প্রভুর আদেশ পাইয়া, হত্যাকাণ্ড হইতে নিরস্ত হইল।

নাদির সাহাই দিল্লী অবরোধের পর দিল্লীশ্বরকে ফকির করিয়া, তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যান। সে সময় অসংখ্য মণিমুক্তার সহিত জগদ্বিখ্যাত "কোহিনুর"ও *

* অনেকে বলেন কোহিনুর হীরক গোলকুণ্ডায় মিরজুমলা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত

তাঁহার হস্তগত হইল। দিল্লীশ্বরের বিপুল অর্থ অথবা মণিমুক্তা লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। সম্রাটের ময়ূরাসন ও আপন পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার মানসে মহম্মদ সাহার এক পরম সুন্দরী কন্যাকেও স্বদেশে লইয়া গেলেন। মহম্মদ সাহার রাজত্বকালে ময়ূরাসনের মূল্য এক কোটী টাকার অধিক ছিল। অনেকে বলে নাদির সাহা মণিমুক্তা ইত্যাদিতে ৭০ কোটী টাকা এদেশ হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। দিল্লীশ্বরের বিপুল অর্থ ভিন্ন, অযোধ্যায় নবাব সদৎ খাঁর নিকট ২ কোটী টাকা ও আমীর ওমরাওর নিকট

হইয়া, সাজাহান বাদসাহকে নজর স্বরূপ অর্পিত হয়। কিন্তু বাবর নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ইব্রাহিম লোদির আগ্রা রাজভবন আক্রমণ করিয়া, এক মহামূল্য হীরক প্রাপ্ত হন। সুলতান আলাউদ্দীন কোন হিন্দু দেবমন্দির হইতে ইহা লাভ করিয়াছিলেন। একজন জহরী সমস্ত পৃথিবীর "অর্দ্ধ দৈনিক ব্যয়" ইহার মূল্য নির্ণয় করেন। ইহাই বোধ হয় জগদ্বিখ্যাত কোহিনূর। নাদির সাহা কর্ত্তৃক ইহা পারস্যে নীত হইলে, কাবুল রাজ আমেদ সাহা তাঁহার রাজভবন আক্রমণ করিয়া, ইহা প্রাপ্ত হইলেন। আমেদ সাহার পুত্র সাহাসুজা পঞ্জাব-কেশরী রণজিতের করতলস্থ হইলে, ইহা তাঁহার হস্তগত হইল। রণজিতের নিকট হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক কোহিনূর গৃহিত হইয়া, ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল; ও এখন ভারতেশ্বরীর মুকুটে শোভা পাইতেছে। আমাদের বিশ্বাস কোহিনূরই শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তভমণি। কৌস্তভ নামের অপভ্রংশ হইয়াই বোধ হয় যাবনিক "কোহিনূর" নামের সৃষ্টি হইয়াছে। হায়! মহামূল্য কোহিনূর একদিন ভারতের ধন ছিল; আজি কোথা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে!!

হইতেও নাদির ভারতের প্রচুর অর্থ অপহরণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির লীলা-ভূমি অনন্ত-রত্নের-নিলয় ভারত একদিনে নিঃস্ব হয় নাই। দীর্ঘকাল হইতেই বিদেশী তস্কর ভারত-রত্ন অপহরণে অনুরত।

বর্ত্তমান দিল্লীর কিল্লার অপর দিকে যমুনাতীরে সেলিমগড় অবস্থিত। ১৫৪৬ খৃঃঅব্দে শেরসাহার পুত্র সেলিম সাহা কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাট হুমায়ুন রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির পর এই দুর্গকে "নরগড়"নামে অভিহিত করেন। জাহাঙ্গীর একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, বর্ত্তমান দিল্লীর পূর্ব্ব প্রান্তের সহিত ইহা সংযুক্ত করিয়াছিলেন। সাজাহান বাদসাহের সময় এই দুর্গ রাজকীয় অপরাধীদিগের (State prisoners) কারা-বাস ছিল। পূর্ব্ব সেতুটী এখন একবারে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আর একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, তদভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

দিল্লীর শিপাহী বিদ্রোহ ও পুনরবরোধ।

মোগল রাজত্বের অন্তিম কালে দিল্লীশ্বর ইংরেজের বৃত্তি-ভোগী রূপে কেবলমাত্র মাসিক ৮০০০০ টাকা পেনশন প্রাপ্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এখনও রাজ-

ভবন অসংখ্য পরিজন ও অনুচর বর্গে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে যে দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর বলিয়া অভিহিত হইতেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য মত্ততা সমস্ত জগতে ছড়াইয়া, কত বিদেশী আক্রমণকারীকে ভারত লুণ্ঠনে লুব্ধ করিয়াছিল; আজি তাঁহারও তাঁহার পরিজন ও অনুচর বর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় মাসিক ৮০০০০ হাজার টাকা মাত্র। বিলাসী যবনরাজ প্রাসাদে ইহাই দারুণ দারিদ্র। এখনও দিল্লীশ্বরের প্রতি লোকের ভক্তি সম্মান পূর্ব্ব ভাবাপন্ন, কিন্তু রাজ প্রসাদের বাহিরে তাঁহার কি ক্ষমতা আছে? আজি ইংরেজ রাজই সর্ব্বময় প্রভু। মহাত্মা সার চার্লস্ মেটকাফ যখন দিল্লীর রেসিডেণ্ট, দিল্লীশ্বরকে তখন তিনি প্রচুর সম্মান করিতেন। কিন্তু লর্ড আমহর্ষ্ট দিল্লীশ্বরকে সে সম্মান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। যে ইংরেজ জাতি এক দিন দিল্লীশ্বরের কৃপা ভিকারী বেশে, তাঁহার একজন সামান্য আমীর অথবা ওমরাওকেও প্রভুর ন্যায় সম্মান করিয়া কৃতার্থ হইত; নিয়তির গতিতে আজি তাহারা সৌভাগ্য শিখরে অবস্থিত। দিল্লীশ্বরকে এখন তাহারা ঘৃণার চক্ষে দেখিবে বই কি। এখন আর ইংরেজ বাদসাহের কৃপাভিকারী নয়। লর্ড আমহর্ষ্ট জুতা ছাড়িয়া, বাদসাহ দরবারে যাইতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারাই এখন প্রকৃত ভারতেশ্বর; বৃদ্ধ বাহাদুর সাহা আজি আমহর্ষ্টকে সমকক্ষ লোকের ন্যায় গ্রহণ করিতেও দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইতে বাধ্য। প্রথম দিবনের সাক্ষাতেই দিল্লী-

শ্বরকে লর্ড আমহার্ষ্টের এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে হইল। পরে বাধ্য হইয়া, তাঁহাকেও লর্ড আমহর্ষ্টের বাড়ী যাইয়া, এক দিবস তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইল। এই দুঃখে, এই অপমানে সম্রাট বাহাদুর সাহা একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়া ছিলেন। কিন্তু কি করিবেন? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় তাঁহার মনেরদুঃখ চক্ষুজলেই নির্ব্বাণ হইয়াগেল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় ও দিল্লীশ্বরের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া, এক মাত্রা নিম্নতর হইল। এখন এলিন্‌বরা বাহাদুরের রাজত্ব। তিনিই এখন প্রকৃত পক্ষে "গ্রেট মোগল" সাজিয়া বসিলেন। বাদ সাহের অন্দরমহল (Harem) ভিন্ন অন্য সমস্তের প্রতিই তাঁহার এখন সম্পূর্ণ প্রভুত্ব। তিনি দিল্লী সহরের বাহিরে বসিয়া ও ভারতের নানা স্থানীয় স্বদেশী বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া, প্রকাণ্ড দরবারের অনুষ্ঠান করিলেন। আর হতভাগা বৃদ্ধ বাহাদুর সাহা দারিদ্র পীড়িত সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীদিগের সহিত রাজভবনে বসিয়া, ভিকারীর ন্যায় এ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। এতদিন দিল্লীশ্বরকে কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি নির্ধি স্বরূপ দিল্লী রেসিডেণ্টের প্রতিবর্ষে একটী নজর উপঢৌকন দিতে হইত। এলিন বরার আদেশে তাহা রহিত হইয়া, সেই অর্থবাদসাহের রাজকীয় ব্যয়-কোষে গচ্ছিত হইল। নজর মুসলমান সম্রাট দিগের এক প্রধান সম্মানের চিহ্ন। এলিনবরার এই অন্যায় হস্তক্ষেপে বাদসাহ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। এদিকে পুনঃ পুনঃ অসম্মানের সঙ্গে, বাদসাহ পরিবারে দরিদ্রতার মূর্ত্তি ও

ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে যাহাদের অতুল ঐশ্চর্য্যের বার্ত্তা জনপ্রবাদের ন্যায় জগতে রাষ্ট্র ছিল, বাদসাহের বৃত্তি অসংখ্য আশ্রয়ধারীতে বিভক্ত হইয়া, এখন সেই মোগল বংশীয় কোন রাজকুমারের ভাগে ২০ কি ২৫ টাকা করিয়া মাসিক ব্যয় নির্দ্ধারিত হইল। ইংরেজ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। ১৮৫৪ খৃঃঅব্দে বাদসাহের প্রথম উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হওয়াতে, লর্ড ডালহৌসী দিল্লীশ্বরের রাজ্য পূর্ণগ্রাস করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বাদসাহের জাক জমক কমাইয়া দিয়া, তাঁহাকে সিংহাসন ও রাজ ভবন পরিত্যাগে, কুতুব মিনারের নিকটস্থ এক রাজ ভবনে যাইয়া, বাস করিতে আদেশ করিলেন। দিল্লীশ্বরের অদৃষ্টে আজি পুনঃ পুনঃ এরূপ অপমান, অসম্মান; আজি গ্রেট মোগলের অদৃষ্টে এই পরিণাম!! পূর্ব্বে যে সম্রাট পরিবারের কাহাকে কখনও দেখিতে পাইলে, জন সাধারণ কৃতার্থ হইত; এখন সে জন সাধারণ বাদসাহ কুমারগণকে সেলামটী পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত। অবস্থায় মনুষ্য-অদৃষ্টে এইরূপ পরিবর্ত্তন। বাদসাহ পরিবার ইংরেজ রাজের এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধে নিযুক্ত হইল। গোপনে গোপনে কি অনুষ্ঠান হইল, ভগবান জানেন। অনেকে নানা সাহেবকেও এই উদ্যোগের একজন উদ্যোক্তা বলিয়া মনে করেন। বাদসাহ পরিবারের প্রতি ইংরেজ রাজের এই অন্যায় ব্যবহারেই ১৮৫৭ খৃঃঅব্দে সেই লোমহর্ষণ বিদ্রোহ কাণ্ডের সংঘটন। সর্ব্ব প্রথমে

মিরাটেই সেই বহ্নির সূত্রপাত হইল। তথায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, দিল্লী-সেনা তাহাদের আগমন প্রতিক্ষায় সসজ্জ হইয়া রহিল।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ১১ই মে একদল বিদ্রোহী সেনা দিল্লীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিদ্রোহী দল দিল্লীতে প্রবেশ করা মাত্রই, দিল্লীর শিপাহী দলও তাহাদের সহিত যোগদান করিল। বাহাদুর সাহা সে সময় ইংরেজের করতলশায়ী নামতঃ সম্রাট। সুযোগ পাইয়া, তাঁহার পুত্রগণ বিদ্রোহী দলের অভিনেতৃ স্বরূপ বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিলেন। দিল্লীর ইয়োরোপীয় স্ত্রী পুরুষগণের অধিকাংশই বিদ্রোহীদের হস্তে নিতান্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া নিহত হইলেন। তাঁহাদের বাসগৃহ সকল ভস্মীভূত হইয়া গেল। অবশিষ্টগণ নানা স্থানে পলায়ন করিয়া, প্রাণ রক্ষা করিলেন। সে সময় বিদ্রোহী দল চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দিল, "কোম্পানিকা রাজ গিয়া হৈঁয়। হিন্দু মুসলমান সব্ এক হো যাও।" আর পারস্য অক্ষরে দিল্লীশ্বরের পুনঃ রাজ্যাভিষেক বার্ত্তা দিল্লীতে প্রকাশিত হইল। মুসলমান বিদ্রোহী দল পথে পথে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে "দিল্লীবাসী' তোমরা প্রস্তুত হও। শীঘ্রই ফিরিঙ্গীগণ এদেশ হইতে দূরীকৃত হইবে। তখন তাহাদের স্ত্রী কন্যাগণ তোমাদের হইবে। ও তাহাদের সন্তান সন্ততি তোমাদের দাস হইবে।" এখন চতুর্দ্দিকেই ঘোর কোলাহল। কোথাও অধিবাসীগণ আপন আপন সম্পত্তি রক্ষায়

ব্যতিব্যস্ত; কোথাও সিদ্ধিপানোন্মত্ত কোন শিপাহী নিজ হস্তে কত জন ফিরিঙ্গি সংহার করিয়াছে, ইহা বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে। দিল্লীই এখন উন্মত্ততায় পরিপূর্ণ।

দিল্লীর এই হত্যাকাণ্ড শ্রবণে জেনেরেল এন্‌সন্ (General Anson) কতিপয় সেনা সংগ্রহ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এ সামান্য সেনায় কি করিবে? প্রচণ্ড বহ্নিমুখে পতঙ্গবৎ তিনি সসৈন্যে ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জেনেরেল বার্ণার্ড (General Barnard) নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তিনিও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিলেন না। তৎপর ব্রিগেডিয়ার জেনেরেল আর্চিডেইল উইল্‌সন (Brigadier General Archidail Wilson) নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, দিল্লী পুনরবরোধ পর্য্যন্ত সহরের বাহিরে বিদ্রোহীদিগের ক্রোধাগ্নি মুখে থাকিয়া, দিন দিন নিঃসৈন্য হইতে লাগিলেন। ইংরেজের ইতিহাস বলে "সে সময় তাহাদের কেবল মাত্র ৭০০০ হাজার "অশিক্ষিত" সেনা প্রায় ৬০০০০ হাজারের অধিক বিদ্রোহী সেনার প্রতিদ্বন্দীতায় দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইংরেজ সেনার কত লোক যে, এ আক্রমণে জীবন-লীলা সংবরণ করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাঠকবর্গকে জানাইলাম না। যে আক্রমণে দিল্লী পুনরধিকৃত হইল; যে অবরোধে ভারতের সিংহাসন হইতে মোগল বংশের নাম একেবারে বিলুপ্ত

হইয়া গেল; যাহার পর ভারতের দাসত্ব সম্পূর্ণ দৃঢ়বদ্ধ হইল; তাহাই অতি সংক্ষেপে এ স্থানে বিবৃত করিলাম।

কাশ্মীর দরজার বহির্ভাগেই লাডলো কেস্‌ল (Ludlow Castle) নামে একটী স্থান আছে। তাহার সম্মুখ ভাগে হিন্দু রাওর * গৃহ। সে স্থান হইতেই কাশ্মীর দরজা আক্রমণ করিবার উদ্দেশে, ইংরেজ পক্ষ তথায় দ্বিতীয় সংখ্যক বেটারি নিযুক্ত করিল। সেই আক্রমণ চিহ্ন আজিও প্রকাশিত থাকিয়া, দর্শকদিগকে সেই ভীষণ কাণ্ডের পরিচয় দিতেছে। ব্রিটিশ সেনার দক্ষিণ পার্শ্বে সবজীমুণ্ডী ও রশিনারা উদ্যান, ও বাম পার্শ্বে যমুনা প্রবাহিত। ভারতের অনেক রাজা সেই সময় ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ছিলেন। পাতি-য়ালার মহারাজা আপন শিক সৈনাদল সহ ব্রিটিশ সেনার

---

* দৌলতরাও সিন্ধিয়ার শ্যালক ও বাইজী বাইএর ভ্রাতা শ্রীজীরাও ঘটকীর নাম হইতেই "হিন্দুরাও" নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা ভাই ভগ্নী উভয়েই ইংরেজের বৃত্তিভোগী রূপে দিল্লীতে বাস করিতেন। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ফিরোজপুরের এক দরবার উপলক্ষে শ্রীজীরাও ঘটকীও তথায় উপস্থিত হইলেন। সে সময় লর্ড অকল্যাণ্ড ও রণজিতসিংহের সহিত পরস্পর আলাপ হইতেছিল। শ্রীজীরাও তথায় উপস্থিত হইলে, রণজিত জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি না ইংরেজের একজন বৃত্তিভোগী?" শ্রীজী উত্তর করিলেন "হাঁ। আপনিও শীঘ্রই হইবেন।" শ্রীজীর বাক্য রণজিতে কার্য্য-পরিণত না হইলেও, দলিপসিংহে তাহা সম্যক প্রতিফলিত হইয়াছিল।

নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আক্রমণে নিযুক্ত। তাহাদের অতি সন্নিকটেই "হিন্দুরাওর গৃহে" (Hindoo Raos house) আটটী কামান রক্ষিত হইল। রেমিংটন (Ramington) সাহেব তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, মুরি দরজা আক্রমণে যত্নপর হইলেন। ইংরেজ পক্ষ হইতে কামানে ভয়ানক অগ্নি বৃষ্টি হইতেছে; অল্প ক্ষণ যুদ্ধের পরই লাড্‌লো কেস্‌ল্ ইংরেজের হস্তগত হইয়া পড়িল।

অন্যদিকে কুড়িসি বাগে মেজর টম্ব (Major Tomb) ১০টী কামান ও কাষ্টম হাউসে মেজর স্কট (Mejor Scott) একদল সেনা লইয়া, আক্রমণে নিযুক্ত হইলেন। ইংরেজ সেনা ৮ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মুরিও কাশ্মীর দরজার উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে। লাডলোকেসল অবরোধের দুই দিবস পরই তথা হইতে আর একটী নূতন বেটারি বিপক্ষ বিরুদ্ধে উন্মুক্ত হইল। ১১ই সেপ্তেম্বর হইতে প্রায় ৫০শ টী কামানে দিল্লীর উপর অবিরাম গোলাবৃষ্টি হইতেছে। শিপাহীদের ভাল অভিনেতা নাই। স্বদেশ উদ্ধারে কৃতসংকল্পই তাহাদের একমাত্র বল ভরসা। কামানের অবিরাম গোলা বৃষ্টিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, মুরি দরজার বিদ্রোহীগণও লাডলোকেসলের বেটারির গোলাবর্ষণে কাশ্মীর দরজার বিদ্রোহী দল কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িল। বিপক্ষের ভীতি দর্শনে ইংরেজ সেনার উৎসাহ এখন দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত। এখন একদল আত্ম রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, অন্যদল দারুণ প্রতিশোধ ইচ্ছার বশবর্ত্তী।

ইংরেজের গোলা বৃষ্টিতে দুর্গ প্রাচীর খণ্ড-বিখণ্ড হইতে আরম্ভ করিল। এই অগ্নি অস্ত্রের নিকট ইষ্টক প্রাচীর সামান্য কথা, পাহাড় পর্ব্বতেরও স্থির থাকা অসম্ভব! কিন্তু ইংরেজেরও ইহাতে সামান্য ক্ষতি হইলনা। কুদিসিবাগের সেনা দলের অনেকেই এই আক্রমণে ধরাশায়ী হইল। তাহাদিগকে দীর্ঘকাল এই স্থানে অবস্থান করিতে হইলে, প্রায় সকলকেই যুদ্ধ শয্যায় শয়ন করিতে হইত।

বিশাল ভারতরাজ্য বুঝি হাতছাড়া হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজের প্রাণপণ। ১৩ই সেপ্টেম্বর আদেশ হইল, তৎপর দিবসই ইংরেজ সেনা নূতন উপায়ে পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করিবে। ১৪ ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনা চারিভাগে বিভক্ত হইয়া, একদল কাশ্মীর বুরুজ, একদল কাশ্মীর দরজা, একদল পানীবুরুজ (Water bastion) ও অন্যদল লাহোর দরজা আক্রমণ করিবার জন্য সশস্ত্র হইল। ভলাণ্টিয়ার সেনাদল তাহাদের পশ্চাতে অবস্থিত, আবশ্যক পড়িলেই তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইবে। এই চারিদল সেনাই আপন আপন লক্ষ্য অবলম্বনে বৃক্ষের ও ঝোপের আড়ালে থাকিয়া, অগ্রসর হইতেছে। সে সময় ৬০ নং পদাতিক সেনা নিতান্ত সাহসে নির্ভর করিয়া, প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হইল। অপরাহ্ণ ৩টার সময় তাহারা লাডলোকেসল অবলম্বন করিয়া, আক্রমণে নিযুক্ত। বিদ্রোহী সেনা রাত্রিতেই ভগ্নপ্রাচীর বালুকা পূর্ণ বেগে সংস্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। সে সমস্ত স্থান পুন-

রায় তোপে উড়াইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত, ইংরেজ সেনাকে পরদিবসের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেলেই, ইংরেজ সেনা পুনরায় আক্রমণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। এখন বিপক্ষ সেনা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ দেখিতে পাইয়াছে। লেপ্টেনেণ্টে সেল্‌কেল্‌ড্ (Salkeld) হোম্ (Home) সার্জেণ্ট কার্মাইকেল (Carmichael) বার্গেশ (Bargess) স্মিথ্ (Smith) বাগ্‌লার হথর্ন্ (Hawthorne) এবং হাবিল্‌দার মাধবের অধীনে ৮ জন দেশীয় সেপাস (Sapers) কাশ্মীর তোরণ প্রবেশ করিতে অগ্রসর। এই অল্প সংখ্যক যোদ্ধা জীবনে নিরাশ হইয়া, কেবল সঙ্কেত ধ্বনির অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদিগকে অধিকক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইল না। এমন সময়ে আকাশ কাঁপাইয়া, রাইফলের গর্জ্জন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হোম সাহেব অমনি ৪ টী বারুদের বেগ ৪ টী সেনার স্কন্ধে চাপাইয়া, অগ্রসর হইলেন। সেলকেল্‌ড্ সাহেব ও তদ্রূপ সেনা লইয়া অগ্রসর। তাহাদের পশ্চাতেই পূর্ণ সেনা দল কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া, তাঁহাদিগকে অনুগমন করিতেছে। হোম সাহেব তাঁহার সেনা চতুষ্টয়সহ পরিখার বাহ্য তোরণে আসিয়া অজ্ঞাত ভাবে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহা খুলিয়াই দেখেন, বিপক্ষগণ পরিখা-সেতু (Drowbridge) তুলিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা অতিকষ্টে ইহা অতিক্রম করিয়া, প্রকৃত তোরণের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। বিদ্রোহী দল তাঁহাদিগের এরূপ অসম সাহস

দেখিয়া। একবারে বিস্ময়াপন্ন! তাহারা কয়েকটী গুলি বর্ষণ করিয়াই, ভয়ে দুর্গফাটক বন্ধ করিয়া দিল। সেলকেল্‌ড্ সাহেবও তাহার সেনা চতুষ্টয় লইয়া, এমন লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু বিপক্ষ সেনা তাহাদের এখন ক্ষুদ্র সংখ্যা দেখিয়া, তাঁহাদের উপর ভয়ানক গোলা গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। একটী গুলিতে সেলকেল্‌ডের বাহু ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি ফুসি (Fussee) কামানে আগুণ দিবার জন্য, আগুণের বোন্দা (Port fire) বার্গেশের হাতে অর্পণ করিয়াই সেতুর উপর পড়িয়া গেলেন। ইহার অব্যহিত পরেই বিপক্ষের গুলিতে বার্গেশের প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল! সেই সময় সার্জেণ্ট কারমাইকেল অগ্রসর হইয়া, বোন্দা (Portfire) গ্রহণ করিলেন ও গুলিতে সংঘাতিক আহত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে স্মিথ দৌড়াইয়া আসিয়াই দেখেন, কামানের পলিতায় আগুণ ধরিয়াছে। তিনি অমনি প্রাণভয়ে লম্ফ প্রদান করিলেন। ইতিমধ্যে কামানে পরিখামধ্যে অগ্নিসংলগ্ন হইয়া, দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া গেল, ও বিগল বাজিয়া উঠিল। অমনি আক্রমণকারী সেনা বিকট ধ্বনিতে কাশ্মীর তোরণ অবরোধ করিল।

ও দিকে পানী বুরুজ ও খুদিসী বাগের সম্মুখস্থ প্রাচীরও ইংরেজ সেনার গোলাবর্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাশ্মীর তোরণ মুক্ত হইলেই, ব্রিগেডিয়ার নিকল্‌সন (Nicholson) স্বদলে বিপক্ষদলকে কাচারী ও চার্চের নিকট হইতে দূর

করিয়া দিয়া; অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিদ্রোহী দল সে সময় শেষ-আত্মরক্ষায় যত্নবান হইয়া, চারিদিক হইতে গোলা বৃষ্টিতে ইংরেজ সেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। যাহাতে ইংরেজসেনা অধিক অগ্রসর হইতে না পারে, তৎজন্য বিপক্ষ সেনা লাহোর দরজার অতি সম্মুখে দুইটী প্রকাণ্ড কামান রাখিয়া, তাহাদের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতেছে। কিন্তু ইংরেজসেনা প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, হঠাৎ অগ্রসর হইয়াই, তাহার একটী কাড়িয়া লইল। অন্যটী এখন পর্য্যন্ত ও বিদ্রোহীদিগের হস্তগত। নিকলসন এই সময়ে আপন তরবারী তুলিয়া, সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে অনুমতি করিলেন; অমনি একটী গুলি আসিয়া তাঁহার বুকে লাগিয়া; তাঁহাকে সাংঘাতিক রূপে আহত করিল। সেই বীর পুরুষের মৃত দেহ আজিও কাশ্মীর দরজার বহির্ভাগে নূতন গোরস্থানে সমাধিস্থ রহিয়াছে।

এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও ১৭ ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে চার্চ, কাচারী, কলেজ গৃহ, কোতোয়ালি, মেগাজিন ও দিল্লী বেঙ্ক ও ১৯ শে তারিখ বারন্ বুরুজ * (Burn Bastion) ইংরেজ সেনার হস্তগত হইল।

---

* ১৮০৮ খৃঃ অব্দে এস্থানে কর্ণেল বার্ণ (Colonel Burn) অতি অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া, হুলকারের অসংখ্য সেনা ও ১৩০ টী তোপের বিরুদ্ধে দিল্লী রক্ষা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধেই ব্রিটিশগণের নিকট ভারত বীর্য্য কিরূপ হীন প্রকৃতির, সম্যক প্রকাশিত হইয়াছিল। কর্ণেল বার্ণের নামানুসারেই এই বুরুজের নাম বার্ণ বুরুজ হইয়াছে।

২০ শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনা কিল্লাতে (Palace) প্রবেশ করিল। বাদসাহ পরিবার পূর্ব্বেই পালায়ন করিয়াছেন। ইংরেজ সেনার দুর্দ্দান্ত হস্ত এখন দিল্লী সংহারে রত। সহর এখন পর্য্যন্ত বিদ্রোহী সেনায় পূর্ণ। ইংরেজের নির্দ্দয় হস্তে তাহারা এখন ইতস্ততঃ নিহত হইতে লাগিল। হতবশিষ্ট বিদ্রোহী সেনা এখন যমুনা পার হইয়া পলায়নে নিযুক্ত। অমনি আকাশ পাতাল কাপাইয়া, কামানের গর্জ্জনে নিনাদিত হইল "ইংরেজ রাজ পুনরায় দিল্লী অবরোধ করিয়াছেন।" আজি হইতে ভারতের দাসত্ব-নিগড় দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল।

বিদ্রোহ সূত্রপাতে বিদ্রোহীগণ যেরূপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল, এখন প্রতিশোধ ইচ্ছার বশবর্ত্তী ইংরেজও তদপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে ক্রটী করিলেন না। ইংরেজের ইচ্ছা পুনরবরোধের পর দিল্লীর কিল্লা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া সমতল করিয়া দেন। কিন্তু মহানুভব সারজন লরেন্স বাহাদুরের ইচ্ছানুসারেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। ভারত রাজধানী দিল্লী পূর্ব্ব অবয়বেই রহিয়া গেল।

অশীতি বর্ষ পর বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর সাহা ও তাঁহার পুত্রগণ পূর্ব্বেই রাজভবন হইতে পলায়ন করিয়া, হুমায়ুনের গোরস্থানে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছেন। সে সময়ও তাঁহাদের সঙ্গে প্রায় ৬।৭ শত অনুচর ছিল। কর্ণেল হডসন তাহাদিগকে অনুগমন করিয়া, আত্ম-সমর্পন করিতে ভয় প্রদর্শন

করিলেন। বৃদ্ধ বাহাদুর সাহা সে সময় একখানা আসনে উপবেশন করিয়া, কেবল কাঁপিতে ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ প্রাণ ভয়ে গোরস্থানের এক নিভৃত প্রদেশে যাইয়া, পালায়ন করিয়াছেন। নিষ্ঠুর হডসন তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া, আত্ম-সমর্পন করিতে বলিলে, তাঁহারা বলিলেন "আমাদিগের জীবন ভিক্ষা দিলে আমরা আত্মসমর্পন করি।" অমনি হডসন বলিলেন "নিশ্চয়ই না। তাহা কখনই হইবে না।" সাহাজাদাদিগকে বাধ্য হইয়াই, এখন আত্ম-সমর্পন করিতে হইল। কর্ণেল হডসন তাঁহাদিগকে সহরে পাঠাইয়া দিলেন, ও ভয় প্রদর্শনে, অনুচরদিগের নিকট হইতে প্রায় ৫০০ শত তরবারি ও অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। তৎপরই হডসনের সেই পৈশাচিক অভিনয়!! তিনি ঘোটকারোহণে ফিরিয়া আসিয়াই, একজন সেনার নিকট হইতে একটী পিস্তল গ্রহণ করিলেন; ও বাহাদুর সাহার হতভাগ্য পুত্রগণকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন "এই পাপাত্মারা আমাদের অসহায় স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে বিনাশ করিয়াছে, তৎজন্য ইহাদের প্রতিও এই শাস্তি প্রদত্ত হইল" ইহা বলিয়াই, একে একে গুলি করিয়া তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিলেন। অনুচরবর্গও ইংরেজের হস্তে নিহত হইল। বাহাদুর সাহার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

দশহরার দিন উপস্থিত। আমরা বিকাল বেলা সহরের

দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে "রামলীলা দেখিতে গেলাম। বঙ্গের শারদীয় উৎসবের ন্যায়, রামলীলা উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রকাণ্ড উৎসব।' হিন্দু মাত্রেই এই লীলাতে নিতান্ত উন্মত্ত হয়। আমরা লীলা স্থলে যাইয়া দেখি, তাহার চতুর্দ্দিক দর্শক মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ, মধ্যভাগের পূর্ব্ব প্রান্তে দশানন রাবণের কাগজ নির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি, রাবণের দুই পার্শ্বে ইন্দ্রজিৎ, বীরবাহু প্রভৃতি রাক্ষস রাজকুমারগণ। পশ্চিম প্রান্তে রাম লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। হিন্দুগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া, মুখস পরিধানে বানর ও রাক্ষস সাজিয়া, রাম ও রাবণানুচর রূপে দলে দলে পরস্পর পরস্পরকে বিপক্ষ পরম্পরায় আক্রমণ করিতেছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এরূপ বানর ও রাক্ষসের যুদ্ধাভিনয় হইল। অবশেষে রামের পক্ষই জয় লাভ করিয়া, প্রকাণ্ড রাবণ মূর্ত্তিতে অগ্নি সংযোগ করিল। অমনি রাবণ মূর্ত্তির অভ্যন্তর হইতে বাজী সকল ছুটিয়া ও ফুটিয়া, রঙ্গভূমি এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সন্ধ্যার সময় রাবণের সৎকার সাধিত হইলে পর, আমরাও গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

৬ই অক্টোবর—আমরা হে—বাবুকে তাঁহার সহৃদয় আদর অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, রাত্রিতে আজমীরে প্রত্যাবর্ত্তন স্থির করিলাম।

পাঠক "দিল্লী লাড্ডুর কথা আমরা একবারে ভুলিয়া যাই নাই। আজমীর প্রত্যাবর্ত্তনের আগেই ভায়ার জন্য সেই ভারত

বিখ্যাত খাদ্য খরিদ করিতে বাহির হইলাম। অনেক দিন যাবত শুনি "দিল্লীকা লাড্ডু যো খাঁয়া উয়ভি ফস্তায়া, যো নেহি খায়া উয়ভি ফস্তায়া।" মনে ভাবিলাম না খাইয়া ফস্তান অপেক্ষা খাইয়া ফস্তানই ভাল। বাজারে যাইয়া শুনি, এখন আর দিল্লীর লাড্ডু বিক্রয় হয় না। মিউনিসিপালিটী বন্দ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে করাতের গুড়ায় মধ্যভাগ পূর্ণ করিয়াই সুন্দর বাহ্যাকৃতিতে ইহা প্রস্তুত হইত। কাযেই খাইয়া না খাইয়া, উভয়তঃই দর্শককে ফস্তাইতে হইত। ভায়ার জন্য দিল্লীর লাড্ডু খরিদ করিতে পারিলাম না বলিয়া, তাহার জন্য কদলী ও বাতাবী প্রভৃতি কতক গুলি ফল খরিদ করিয়া লইলাম। আর শীতকালে (সে দেশে বড় শীত) ভায়ার গলা বাঁধিবার জন্য একটী মোরাদাবাদী গিল্টি করা গলবন্দ লইলাম। এখন রাগ করা অথবা খুসি হওয়া শ্রীমান ভায়ার ইচ্ছা।

আমাদের আজমীর প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি রাজপুতানা, মালব দেশ, মধ্যভারতবর্ষ ও বম্বে প্রেসিডেন্সির যে সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিয়াছি, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিব। পাঠকবর্গ, আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা এ স্থানেই আপনাদের নিকট হইতে প্রথম খণ্ডের বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সম্পূর্ণ। —

নিবেদন।

ভারত ভ্রমণ প্রথম খণ্ডে যে সমস্ত ভ্রম রহিয়া গিয়াছে তাহার কয়েকটী স্থলে পাঠকদিগের অর্থ বুঝিতে গোলযোগ হইবে, তজ্জন্য আমরা নিম্নে কয়েকটী মাত্র ভুল সংশোধন উল্লেখ করিলাম। পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকে সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১৪	যার	দার
৬১	১৬	ইংরেজী গ্রন্থ	ইংরেজী গ্রন্থ
৪৪	২১	০	না।
২২৯	৩	এমন	এখন
২২৯	৪	এখন	এরূপ
২২৯	১০	বার্ণেশের	বার্ণেশের
২২৮	১৫	প্রাণভয়ে লম্ফ	প্রাণভয়ে পরিখা মধ্যে লম্ফ
২২৮	১৫	কামানে পরিখা	কামানে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া

—০—

গ্রন্থকার।

বরদা বাবুর গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কতিপয় সংবাদপত্র ও মাসিক সন্দর্ভের সমালোচনা।

"PROTIBHA—by Barada Kanta Sen Gupta.

Like the other two works noticed above (Bengali Meye and Chira Shangini) this one is also written with a social purpose. In structure and execution, however, it is immensely superior to the two preceding works. The course of events in this story is of the most natural kind and does not, like the two stories examined above, conflict with any custom, usage or practice of Hindoo Society. Protibha is a model Hindoo Girl, all above, all simplicity, all obedience and all resignation. She is portrayed with true dramatic skill. As a child, she is sweet and charming;

s a grown up girl, she is charming, noble and grand. Her calm resignation under her early misfortunes moves us far more strongly and effectively against infant marriage than all the rebellious movements, the theatrical laments and hystirical harangues of heroines like those of Chita Shangini or Bengali Meye. Babu Barada Kanta Sen Gupta has written a tale which is thoroughly Bengali, except in one particular, and that is why his tale has been so charming and impressive. The tale though short and unpretending will have a chastening and elevating influence on the mind. We shall never forget Protibha for she is one of the sweetest, loveliest and noblest characters in Bengali litarature. We have not seen children's love delineated any where lse of Bengali litarature with such ease and grace and delity to nature, as we do in Protibha. The only un-Bengali part of the story is the very last portion, in which Protibha is represented as writing a letter to Gunendra, esiring an interview with him. A Bengali widow of the levated type of Protibha is a genuine Stoic, who will ury for ever her fondest desires and remembrances with ommencement of her widowhood and fill up the measure f her noble self-saprifice by calmly suppressing the most acred fire that may be burning in her heart. The un-Bongali turn given to the story in this part, is due to the uthor's English education and is indicative of a kind f mental weakness, which in Europe in the present day misstyled "refinement of feeling." Taken by itself, owever, it is not a very bad turn and may be excused. We therefore recommend Protibha to all our readers and specially to the many Bengali novelists who write novels ith a social purpose. Those novelists may get many ood and useful hints by reading Protibha with care and ttention".

January 1886. *The Calcutta Review.*

চাঁদের বিয়ে—শ্রীবরদাকান্ত সেনগুপ্ত বিরচিত। মূল্য দুই পয়সা। আমরা এই ক্ষুদ্র পদ্যময়ী পুস্তিকা খানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। আজ কাল এরূপ গ্রন্থ

সকলেই লেখেন বটে, কিন্তু ইহার লেখার ভাব ও প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন, সুন্দর ও বিশুদ্ধ। আমরা ইহার লেখা দেখিয়া, বরদা বাবু যে একজন উত্তম সাময়িক কবি তাঁহার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি। ভরসা করি বরদা বাবু সময়ে সময়ে আমাদিগকে এরূপ সুন্দর সুন্দর উপহার দিয়া সুখী করিবেন। লেখার পরিচয় জন্য নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

* * * * * * * *
* * * * * * * *

—:০:— সময় ১১ই চৈত্র ১২৯১।

প্রতিভা—একটী বালিকার কথা; সামাজিক উপন্যাস। শ্রীবরদাকান্ত সেনগুপ্ত বিরচিত। মূল্য চারি আনা। আজ কাল আমাদের দেশে বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভূরি ভূরি উপন্যাস গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে প্রায় সকলই ইংরাজি গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত, না হয় ইংরাজি গ্রন্থের ভাব অবলম্বনে লিখিত। আবার কতক গুলি লেখক আছেন, তাঁহারা নায়ক নায়িকাকে হঠাৎ কোন ডাকাইতের হস্তে, সমুদ্রে অথবা অন্য কোন ভয়ানক স্থানে ফেলিলেন, তৎপরে সেই বিপদাবস্থায় নায়ক নায়িকার প্রণয়ের সূত্রপাত করিয়াছেন। সচরাচর যেরূপ প্রণয়ের রীতি নীতি কার্য্যে পরিণত দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থকার দিগের ভাব ও প্রণালী তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অনেকেই প্রায় নায়ক নায়িকার দেখা হইবা মাত্র, তাহাদিগকে একেবারে পাগল করিয়া তুলেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। প্রণয় পবিত্র ধন, ইহার সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না। কিন্তু বরদা বাবুর এই প্রতিভায় সে সকল দোষ কিছুই নাই। প্রতিভা আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। আজ কাল আমাদের দেশের ও সমাজের যেরূপ রীতি নীতি ও সমাজের যেরূপ দুর্দশা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের সমাজ সংস্কার বিষয়ক কোন গ্রন্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও

আদরের ধন। বরদা বাবুর পুস্তক সেই সমাজ সংস্কার নিমিত্ত রচিত। প্রতিভায় তিনি সরলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আবার সমাজের কুৎসিত অঙ্গ জগদম্বার পরিচয়ে সমুদয় পরিচিত করিয়াছেন। এরূপ সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। বরদা বাবুর লেখা পড়িতে পড়িতে জনসন, আডিসন ইত্যাদি ইংরেজী সুলেখক দিগের লেখা মনে পড়িল। আমাদের পাঠদ্দশায় ও অন্যান্য সময় তাঁহাদের লেখা যখন পাঠ করিয়াছি, তখনই যে কোন লেখা পড়িনা কেন, আমাদের মনে হয় যে, আমাদের মনের কথাগুলি যেন ঠিক লিখিয়াছেন। এবং তদতিরিক্ত বুঝি আর কোন কথা নাই; এবং আরো মনেহয়, ইহা অপেক্ষা অন্য কোন ভাষায় সরল কিম্বা প্রস্ফুটিত হইবেনা; এই সকল ভাব এই সকল কথা ভিন্ন অন্য কোন বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে হইলে বুঝি হৃদয়ের ভাব হৃদয়েই থাকিয়া যাইবে। বরদাবাবুর প্রতিভা পাঠে আমরা সেই ভাবাপন্ন, সেইরূপ সুখী হইয়াছি। প্রতিভা যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তাহার আনুষঙ্গিক সকলই সেইরূপ সুন্দর। এমন কি প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে হইয়াছে, কাঁদিতে হইয়াছে। প্রতিভা বঙ্গ সাহিত্য সংসারে একটী অমূল্য ধন। ভরসা করি বরদা বাবু তাঁহার খনি হইতে প্রতিভার মত আরও কিঞ্চিৎ রত্ন উদ্ধৃত করিয়া, দরিদ্র বঙ্গ সাহিত্যের অভাব মোচন করিবেন। আমরা আশাকরি প্রতিভা যেমন সুন্দর, সেরূপ সকলের আদরণীয় হইবে। সময় ১১ চৈত্র ১২৯১।

———:•:———

প্রতিভা—ছোট্‌টো মেয়েটীর ছোট্‌টো গল্প, বেশ পরিষ্কার, সুন্দর ও মধুর। লেখকের সংক্ষেপে চরিত্র বর্ণনায় ক্ষমতা আছে। তাঁহার সোনার পুতুল প্রতিভাকে তিনি যে ভাবে আঁকিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বড় সুন্দর হইয়াছে। সে বালিকাটীকে প্রথম যখন তাহার মাতার সহিত কথা বার্ত্তা

কহিতে দেখিলাম, তখন হইতে সেই যে তাহার স্বভাবে আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। শেষ যখন না তাহার ক্ষুদ্র জীবনের শেষ অঙ্কের অভিনয় দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিলাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর আমাদের সে মুগ্ধতা ঘুচিলনা। এ ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আমরা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।

——:০:—— কল্পনা

চাঁদেরবিয়ে—এই সরল কবিত্বময় ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। ১০) পয়সা ব্যয় করিয়া যাঁহারা এই পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহারা প্রতারিত হইবেন না। ——:০:—— নব্যভারত

প্রতিভা—প্রতিভার চরিত্র মোটের উপর সুন্দর হইয়াছে। দুই এক স্থানে কেবল একটুকু অস্বাভাবিক বোধ হইল। প্রতিভার মাতার মৃত্যু বর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। জগদম্বার চিত্রটী পুস্তকে না দিলেই ভাল হইত।

* * * * *

প্রতিভার ভাষা সরল, স্বাভাবিক সহজ ও মধুময়। এই উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকার তাঁহার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ——:০:—— নব্যভারত

চাঁদেরবিয়ে—যদিও এই পুস্তক খানি আয়তনে ক্ষুদ্র তথাপি রচনা চাতুর্য্যে ক্ষুদ্র নয়। ইহার স্থানে স্থানে সুন্দর কবিতা আছে। চাঁদ এক দিন ভাবিতেছেন আমি একাকী কেন? তাই তিনি বলিতেছেন।

* * * * *

সন্ধ্যাদেবী ঘটকালীতে খুব নিপুণ। তাহার ঘটকের মতই যাত্রা ঘসা লম্বা চৌড়া কথা। সন্ধ্যা বলিতেছেন—

* * * * *

আমরা এই বই খানি পড়িয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম। আশাকরি লেখক ইহা হইতেও ভাল ভাল উপহার আমাদিগকে প্রদান করিবেন। ২৩শে চৈত্র ১২৯১।

——:০:—— সারস্বতপত্র

হেমপ্রভা—আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয় পরম সুখী হইয়াছি। আজ কাল যে প্রণালীতে উপন্যাস লেখা হয়, বরদা বাবু এই উপন্যাস খানি সেইরূপে ও সেই নিয়মে লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রথম উদ্যম। এখানি প্রথম উদ্যম বলিয়াও সচরাচর যে সকল উপন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, তদপেক্ষা অনেক উচ্চ। বরদা বাবু যেরূপ সুলেখক তাহা আমরা গতবারে পরিচয় দিয়াছি।

১৮ই চৈত্র ১২৯১। ——:০:—— সময়

এতদ্ভিন্ন "সঞ্জীবনী," "বঙ্গবাসী" "Bengal Public Opinion প্রভৃতি পত্রিকা, হেমপ্রভা, চাঁদের বিয়ে, প্রতিভা প্রভৃতি গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবু প্রতিভার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত সেন প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ক্রমে ক্রমে শীঘ্রই মুদ্রিত হইতেছে।

অতুলচন্দ্র (সামাজিক উপন্যাস) হীরা বাই (ভিন্ন-দেশীয় সামাজিক উপন্যাস) মোহিনী (এক বুড়ীর কথা), বসন্ত (সামাজিক উপন্যাস), আমার গান (কবিতা পুস্তক) সরোজা (উপন্যাস) লতিকা (কবিতা পুস্তক)।

কে, সি, দাঁ এবং কোম্পানি

১৪ নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।